দাম : ষোলো টাকা

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুই আধুনিক ভারতের পথপ্রদর্শক— পৃঃ ২৬

স্বস্তিকা

সুভাষচন্দ্র ও হিন্দুত্ব — পৃঃ ২৪

৭৫ বর্ষ, ২১ সংখ্যা।। ২৩ জানুয়ারি, ২০২৩।। ৮ মাঘ - ১৪২৯।। যুগাব্দ - ৫১২৪।। সাধারণতন্ত্র বিশেষ সংখ্যা।। website : www.eswastika.com

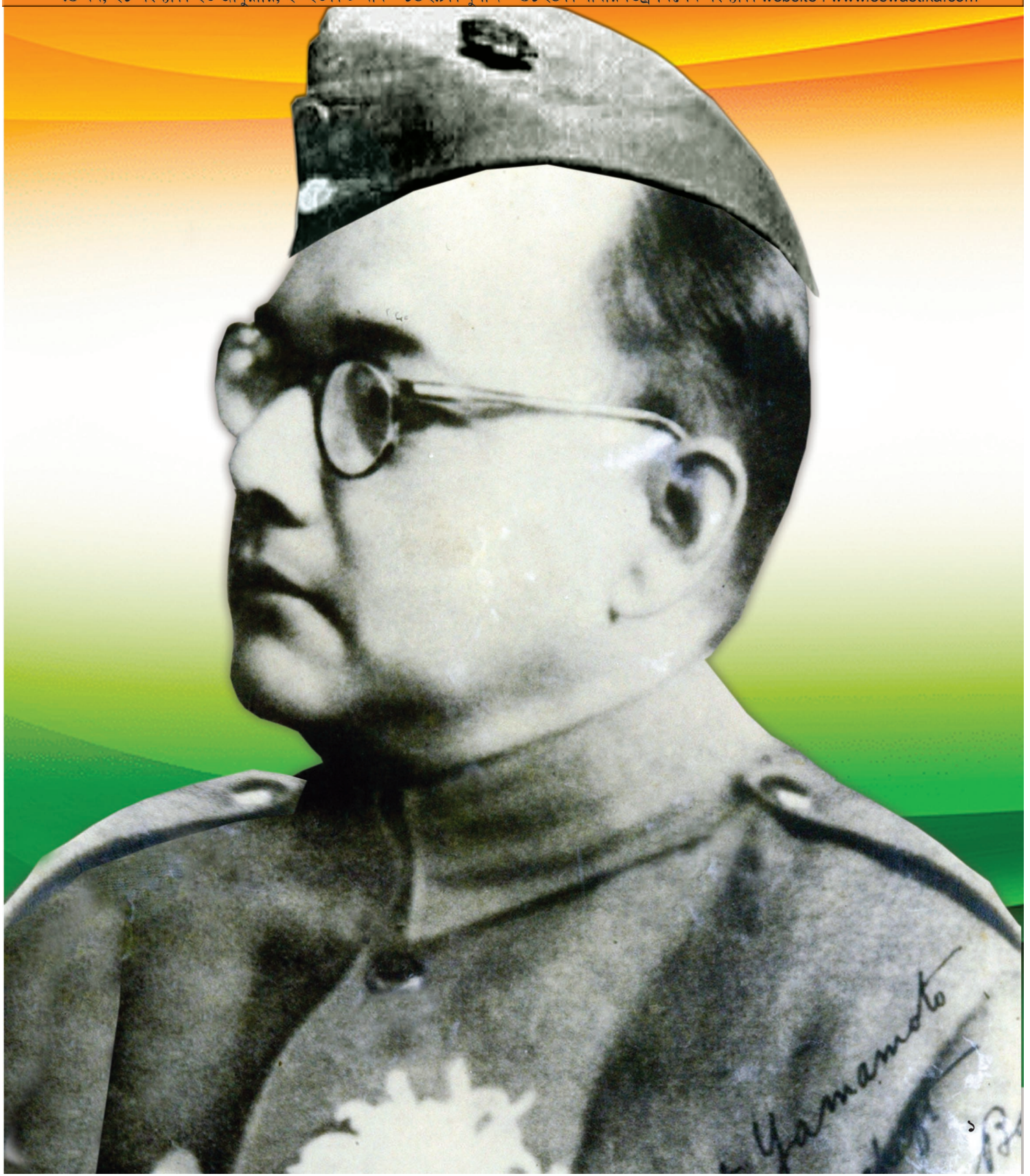

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

সাধারণতন্ত্র বিশেষ সংখ্যা

৭৫ বর্ষ ২১ সংখ্যা, ৮ মাঘ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

২৩ জানুয়ারি - ২০২৩, যুগাব্দ - ৫১২৪,

Website : www.eswastika.com

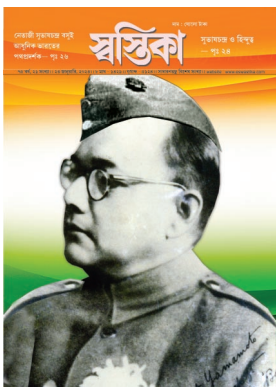

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

'শিব ঠাকুরের আপন দেশে আইন কানুন সর্বনেশে' সে গাঁয়ের আপনি মোড়ল মমতা □ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

ভয় করছে দিদি, কেউ যে ভয় পাচ্ছে না □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

মুসলমানদের নিয়ে সরসঙ্ঘচালকজীর বক্তব্যের অপব্যাখ্যা কাম্য নয় □ রাম মাধব □ ৮

প্রশ্নের মুখে পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক পরিবেশ □ বিশ্বামিত্র □ ১০

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আজও ভারতবাসীর হৃদয়ে অমলিন □ মণীন্দ্রনাথ সাহা □ ১১

ভারতীয় সংবিধানের অপব্যাখ্যা এবং অপ্রয়োজনীয় কাটাছেঁড়া বন্ধ হোক □ ড. তরুণ মজুমদার □ ১৪

ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মবাণী ভারতের সংবিধান □ অজয় সরকার □ ২১

সুভাষচন্দ্রের নেতাজী হয়ে ওঠার নেপথ্যে শিক্ষক বেণীমাধব দাস □ দিগন্ত চক্রবর্তী □ ২৩

সুভাষচন্দ্র ও হিন্দুত্ব □ রাজদীপ মিশ্র □ ২৪

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুই আধুনিক ভারতের পথ প্রদর্শক □ মলয় দাস □ ২৬

বিবাহের বার্তা ছড়িয়ে নেতাজীকে কলঙ্কিত করার অপচেষ্টা □ কল্যাণ গৌতম এবং সৌকালিন মাঝি □ ২৯

নদী থেকে দেবীতে রূপান্তরিত হয়েছেন মা সরস্বতী □ রামানুজ গোস্বামী □ ৩১

সোশ্যালমিডিয়া গণতন্ত্র রক্ষার অন্যতম হাতিয়ার □ অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৩৫

ভারতে গণতন্ত্র রক্ষায় গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ভূমিকা □ বিমলশঙ্কর নন্দ □ ৩৬

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সংবাদপত্রের ভূমিকা □ সুজিত রায় □ ৩৯

বিচারব্যবস্থায় অস্বচ্ছতা সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক □ ধর্মানন্দ দেব □ ৪৩

সাধারণতন্ত্র দিবস এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ □ ড. শ্রীরঙ্গ গোডবোলে □ ৪৭

প্রকাশিত হবে ৩০ জানুয়ারি ২০২৩

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ৩০ জানুয়ারি ২০২৩

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

মিড মে মিলে টিকটিকি

একটা সময় ছিল যখন গরিব পরিবারের ছেলেমেয়েরা স্কুলের শিক্ষা শেষ হবার আগেই রোজগারের তাগিদে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হতো। এই প্রবণতা আটকাতে সরকার প্রতিটি স্কুলে মিড ডে মিলের ব্যবস্থা করে। উদ্দেশ্য, স্কুলপড়ুয়াদের পুষ্টিকর খাবার দেবার পাশাপাশি গরিব পরিবারগুলির ওপর থেকে অর্থনৈতিক চাপ কমানো। এমন একটি সাধু উদ্দেশ্য তৃণমূল শাসিত পশ্চিমবঙ্গে চরম অবমাননার মুখোমুখি হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের খাবারে আজকাল টিকটিকি, ইঁদুর, সাপ পাওয়া যাচ্ছে। সেই সঙ্গে শুরু হয়েছে মিডি ডে মিলের বরাদ্দ থেকে কাটমানি খাওয়া।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয় রাজ্যে মিড ডে মিলের হাল-হকিকত। লিখবেন ড. রাজলক্ষ্মী বসু, ভবানীশংকর বাগচী, বিশ্বপ্রিয় দাস প্রমুখ।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। আগামী ১ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। এটি এক ধরনের অনুদান মাত্র। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

গণতন্ত্রের জননী ভারত

ভারতের সাধারণতন্ত্র দিবস হইল জাতির জীবনে একটি মহত্ত্বপূর্ণ দিন। কেননা ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট শুধুমাত্র ক্ষমতার হস্তান্তর হইয়া দেশ স্বাধীন হইয়াছিল মাত্র। তখনও স্ব-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। স্বাধীন ভারতেও দেশের প্রধান রূপে ইংল্যান্ডের রাজা ষষ্ঠ জর্জ এবং ভারতের গভর্নর জেনারেল ও সেনাধ্যক্ষ রূপে লুই মাউন্টব্যাটেন ছিলেন। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতীয় সংবিধান কার্যকরী হইবার পর এবং ব্রিটিশ পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক চিরতরে ভারতের আকাশ হইতে অবতরণ করিবার পরই স্বাধীনতা লাভের প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার সঙ্গেই ভারত গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে তাহার যাত্রা শুরু করিয়াছে। এইদিন হইতেই ভারতবাসী প্রকৃতপক্ষে স্বতন্ত্রতা লাভ করিয়াছে। এইদিন হইতে তাহারা স্ব-তন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছে। এইদিন হইতেই ভারতবাসী নিজেদের সংবিধানের বলে দেশ গঠনের অধিকার লাভ করিয়াছে। এই দিনটি সাধারণতন্ত্র বা গণতন্ত্র দিবস রূপে ভারতবাসীর নিকট বড়োই আবেগের দিন। কেননা ১৯৩০ সালে এই দিনটিতেই পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্প ঘোষিত ও গৃহীত হইয়াছিল।

ভারতবাসীর একান্ত গর্বের বিষয় যে ভারতীয় গণতন্ত্র বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র বলিয়া মান্যতা লাভ করিয়াছে। গণতন্ত্রের ধারণাটি ভারতবর্ষে নূতন নহে। ভারতের গণতন্ত্র কম করিয়াও আড়াই হাজার বৎসরের পুরাতন। বৈশালী ও লিচ্ছবি-সব তৎকালীন ভারতবর্ষের ষোড়শ মহাজনপদের গণরাজ্যগুলি গণতন্ত্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সেই সময় হইতে অদ্যকার ভারতেও আইনসভা, বিচার ব্যবস্থা, সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমের মতো গণতান্ত্রিক স্তম্ভগুলি সগৌরবে সক্রিয় রহিয়াছে। সংবিধান প্রণেতাগণ প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও চেতনার বিষয়গুলিকে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাহাকে জীবন্ত করিয়াছেন। ইহার জন্যই ভারতের গৌরবময় অতীত হইতে প্রেরণা লইয়া নূতন ভারত গড়িবার পথ প্রশস্ত হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হইল, সংবিধান প্রণেতাদের ভাবনা ও বিচারশক্তিকে বারবার ব্যাহত করিয়াছে স্বাধীন ভারতের কংগ্রেস সরকার। ক্ষমতার দম্ভে বহুবার তাহারা সংবিধানের অপব্যবহার করিয়াছে। একানব্বই বার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত রাজ্য সরকারের পতন ঘটাইয়াছে। তাহাদের সবচাইতে ন্যক্কারজনক কাজ হইল দেশে জরুরি অবস্থা জারি করিয়া বিরোধীশূন্য সংসদে সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'সেকুলার' ও 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দ দুইটির সংযোজন। ইহা সংবিধান প্রণেতাদের চিরন্তন ভাবনার উপর একটি বড়ো ধরনের আঘাত। ভারতবর্ষ চিরকাল সর্বধর্ম সমভাব নীতিতে চলিয়াছে। ভারতবর্ষের প্রকৃতিই তাহা। তাই সংবিধান প্রণেতাগণ আলাদাভাবে তাহা সংযোজন করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। সংবিধানে সকল নাগরিকের জন্য সমান অধিকারের কথা থাকিলেও কংগ্রেস সরকার নানা ধারা উপধারা যুক্ত করিয়া কিয়দংশ দেশবাসীর মধ্যে শুধুমাত্র অধিকারের ভাবনা জাগ্রত করিয়াছে। কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ করে নাই। ইহাতে গণতন্ত্রের মর্যাদা বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বই কী।

স্বাধীনতার বহু বৎসর অতিবাহিত হইলেও অদ্যাবধি দেশে জাতপাত ও বৈষম্যমূলক সমস্যাগুলি সক্রিয় রহিয়াছে। অশিক্ষিত কতিপয় রাজনীতিকের অসাংবিধানিক কথাবার্তা, রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন,পারিবারিক আধিপত্যের মতো বিষয়গুলি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে প্রতিনিয়ত খর্ব করিতেছে। পূর্বতন বাম আমল হইতে শুরু করিয়া বর্তমান তৃণমূল শাসিত পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের অবক্ষয় চরম আকার ধারণ করিয়াছে। দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়নে বর্তমানে এই রাজ্যের শাসকদলের নেতা-মন্ত্রীরা শিরোপা অর্জন করিয়াছেন। এই রাজ্যে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারটুকুও তাহারা কাড়িয়া লইয়াছেন। গণতন্ত্র দিবসে গণতন্ত্রের জননী ভারতে সংবিধানের আদর্শকে আরও শক্তিশালী করিবার জন্য দেশবাসীর আরও দায়িত্বশীল হইবার প্রয়োজন রহিয়াছে। জনগণের সচেতনতার অভাবেই এইভাবে বারে বারে গণতন্ত্র লাঞ্ছিত হইতেছে। গণতন্ত্র যেইহেতু জনগণের, সেইহেতু দেশের বিশাল জনসংখ্যাকে গণতন্ত্র বিষয়ে আরও সচেতন হইতে হইবে।

সুভাষিতম্

বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যং বালাদপি সুভাষিতম্।
অমিত্রাদপি সদ্বৃত্তম্ অমেধ্যাদপি কাঞ্চনম্।।

বিষের মধ্যে অমৃত পাওয়া গেলেও তা গ্রহণ করা উচিত, বালকের কাছ থেকেও ভালো কথা শেখা উচিত, শত্রুর কাছ থেকেও ভালো গুণ গ্রহণ করা উচিত এবং নোংরার মধ্যেও সোনা পাওয়া গেলে তা স্বীকার করা উচিত।

‘শিব ঠাকুরের আপন দেশে আইন কানুন সর্বনেশে’

সে গাঁয়ের আপনি মোড়ল মমতা

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

‘গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল’ মমতার দেশে যে আইন কানুন সর্বনেশে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংবিধান বিরোধী এই দাবিটা ফুটপাথের চায়ের দোকান আর পোড়ো বাড়ির বৈঠকখানায় চলতে পারে। তবে সুকুমার রায়কে ধার করে বলতে পারি ‘শিব ঠাকুরের আপন দেশে’ অর্থাৎ মমতা রাজ্যে ‘আইন কানুন সর্বনেশে’। আর সে গাঁয়ের মোড়ল মমতা।

মমতা ইসলামি ইতিহাসের ছাত্রী। ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাস কতটা জানেন আমি জানি না। আইনের পাশ দিয়েছেন। আর তাতেই সমস্যা। নিজেই সংবিধানের বিধান দেন। ওই বিষয় পরামর্শ দিতে গেলে তিনি ঘুরে বসেন। পরামর্শদাতাকে ধমকে চুপ করিয়ে দেন। শুনেছি ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যের প্রাক্তন এক মুখ্যসচিবকে দাবড়িয়ে চুপ করিয়ে দিয়েছিলেন।

অজান্তে ফরাসি রাজা চতুর্দশ লুইয়ের বদগুণ তাঁর মধ্যে রয়েছে। লুইয়ের মতো মমতার ধারণা ‘আই অ্যাম দ্য স্টেট বা আমি-ই রাষ্ট্র’। ৪২ লোকসভা আর ২৯৪ বিধানসভা আসনে তিনি প্রার্থী। তৃণমূলের বাকিরা ফাউ। মমতা হাত দিয়ে মাথা কাটেন। খোলামকুচির মতো ঘন ঘন অ্যাডভোকেট জেনারেল পালটাতে থাকেন মমতা। এক বছরের মধ্যে তিনজনকে মুড়িমুড়কির মতো পালটেছেন মমতা। বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি ‘সুপার ল’ বা সর্বোচ্চ আইন। বাকিরা কর্মচারী।

রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ছাড়াই কেন্দ্রীয় জমি অধিগ্রহণ আইন বা ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট পালটে সিঙ্গুর উন্নয়ন বিল এনেছিলেন মমতা। আদালতে তা বাতিল হয়ে যায়। জোর করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে পুনর্নিয়োগ করেন। তা বেআইনি বলে জানায় আদালত। জেদ ফলাতে উচ্চ আদালতে গিয়েছেন মমতা। উপাচার্যের স্বামী রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যসচিবকে কেন্দ্রীয় নিয়মের বিরুদ্ধাচরণে উত্তেজিত করেন মমতা। সচিব বেচারি তা হাড়ে-মজ্জায় টের পাচ্ছেন। মমতার আইনি বদান্যতায় রাজ্যের প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমার পুলিশের তকমা ছেড়ে তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরের সচিব হয়ে রয়েছেন স্বেচ্ছা নির্বাসনে। জোর করে আইন পালটে মমতা রাজ্যের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হয়ে বসে পড়েছেন। এখন অবধি রাজ্যপাল সে অনুমোদন দেননি। মমতার ‘দুয়ারে রেশন’ কেন্দ্রীয় আইন লঙ্ঘন করেছে আর তা বাতিলযোগ্য বলে জানিয়েছে আদালত। তবে মমতার সবচেয়ে কলঙ্কজনক আইন লঙ্ঘনের নিদর্শন সরকারি কর্মচারীদের ন্যায্য ডিএ বা মহার্ঘভাতা কেন্দ্রীয় হারে না দেওয়া।

রাজ্যের অধিকাংশ চটকল মালিক শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড আর গ্র্যাচুইটির টাকা আত্মসাৎ করে রেহাই পেয়ে রয়েছেন। ওই সব অসাধু চটকল মালিকদের মতো মমতাও বাধ্যতামূলক মহার্ঘভাতা থেকে সরকারি কর্মচারীদের বঞ্চিত করে রেখেছেন। তা আটকাতে সমানে মামলা করে চলেছেন যদিও মমতা জানেন যে মহার্ঘভাতা দিতে তিনি বাধ্য।

মমতা নিজের তৈরি সংবিধান আর আইন চালু করেন। তাই তিনি সংশোধিত নাগরিক বিল বা নাগরিকপঞ্জি মানতে নারাজ। উলটে মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছেন। তিনি প্রথম জম্মু কাশ্মীর পুনর্গঠন বিল আর নোটবন্দির বিরোধিতা করেছিলেন। জম্মু কাশ্মীর বিল এখন আদালতের বিচারাধীন। তবে নোটবন্দির পদ্ধতিতে সায় দিয়েছেন সুপ্রিম আদালত। সে সূত্রেই মমমতাকে ‘সন্ত্রাসের দোসর’ বলে ব্যঙ্গ করছেন বিরোধীরা। ২০১৬-তে নোটবন্দি করা হয়েছিল কালো টাকা আর সন্ত্রাসের অর্থ বন্ধ করতে। মমতা ভালোই জানেন এই নাগরিক বিল বা পঞ্জির বিরুদ্ধাচরণ অসাংবিধানিক। এরপর বিরোধীরা যদি তাঁকে সংবিধান বিরোধী বলেন তাতে আমি খুব একটা দোষের কিছু দেখি না।

তবে নিজের সংবিধান তৈরি করা বা আইন প্রণয়নের সব দোষ আমি মমতাকে দেব না। এটা সবাই জানেন মমতা স্তাবক পছন্দ করেন। তাই তাঁর বশংবদ কিছু অল্পজানা ‘মমতাজীবী আইনজীবী’ তাঁকে ঘিরে রেখে অনবরত আইনের ভুল ব্যাখ্যা করছেন। আত্মরক্ষার স্বার্থে মমতা ওই সব বশংবদ আর অল্পজানাদের বেশি পছন্দ করেন আইনজ্ঞদের বদলে। প্রথিতযশা আইনজ্ঞ আর আইনজীবী অনিন্দ্য মিত্র বা জয়ন্ত রায়কে দরজা দেখিয়ে দিতে মমতা কোনো দ্বিধা বোধ করেন না। যতদূর মনে পড়ে আইনের রক্ষক হিসেবে একবার তিনি উকিলের কালো পরিধানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আর সেই থেকেই বোধহয় তাঁর ধারণা হয় তিনি আইনের শেষ স্টেশন।

শাসক হওয়ার পর সে ভুল ধারণা আরও জোরালো হয়ে বসে। সব শাসক তাই। ব্যতিক্রম তারাই যারা দেশের সংবিধান আর সংস্কৃতির সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখেন। মমতা ব্যতিক্রম কারণ তিনি ভুল স্বীকার করেন না। রাজা সাজার পর থেকেই মমতা রাজ্যে নিজের আইন চালু করেছেন। অথচ প্রকৃত দেশের আইন মেনেই তিনি ছ’বার সাংসদ চারবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আর দু’বারের মুখ্যমন্ত্রী। এই বৈপরীত্য ভাবলে অবাক লাগে। তাহলে মমতা কি সত্যি সংবিধান বিরোধী। নাকি কেবল মোড়ল। অন্য কিছু নয়। □

ভয় করছে দিদি, কেউ যে ভয় পাচ্ছে না

ভয়দাত্রীষু দিদি,

এটা কী হলো বলুন তো! কেউ তো কাউকে ভয় পাচ্ছে না। দিদি, আমার কিন্তু এটা মোটেও ভালো লাগছে না। ভোটের সময় আপনি বলেছিলেন রাজ্যের সব কেন্দ্রে আপনিই প্রার্থী। গর্বে আমার বুক ফুলে উঠেছিল। আপনার অনুগত ভাই হিসেবে এখন উলটোটা হচ্ছে। মানে যেখানে যেখানে বিক্ষোভের মুখে পড়ছেন তৃণমূল বিধায়করা আমার খালি মনে হচ্ছে সেই বিক্ষোভ তো আসলে আপনাকেই দেখানো হচ্ছে। আপনাকেই তো সবাই জিতিয়েছিল। নন্দীগ্রাম ছাড়া।

টানা তিনবার যে দল রাজ্যের ক্ষমতায় এসেছে তার সাংসদ, বিধায়কদের সামনে এমন লাগাতার সরব দাবিদাওয়া ও ক্ষোভ তো অতীতে দেখা যায়নি! হলো কী দিদি? কেউ কি আর ভয় পাচ্ছে না?

ছোটোবেলায় আমার মা খুব বকতেন আমায়। মারতেনও। তখন আমার নিঃসন্তান পিসিমা বলতেন, 'ওরে, ছেলেটাকে অত মারিস না। সবেতে বকিস না। ধ্যাতা হয়ে যাবে।' আমার মনে হচ্ছে আপনার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। মারধর খেতে খেতে এই রাজ্যের গরিব গুর্বো মানুষগুলো ধ্যাতা হয়ে গিয়েছে। ভাবছে আর কী ক্ষতি হবে? যা হবার তা তো হয়েছেই। বরং, মনে যা আছে বলে ফেলা যাক। ওই যে ছেলেটা চড় খেল। এবার ওঁর তো আর কিছু হারাবার নেই। শুনছি, ওঁর বিরুদ্ধেই পুলিশ মামলা করেছে। সুতরাং, বাকিরা ভাববে চড় মারা, মামলা করা হয়ে গিয়েছে। এবার আর হারাবার কী আছে। জয় করার জন্য যদি কিছু থাকে দেখা যাক না!

আপনি বলেছিলেন, এই কর্মসুচিতে শোনার চেয়ে নেতাদের বলতে হবে বেশি। 'দিদির সুরক্ষা কবচ' মানে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের কথা মানুষের কাছে গিয়ে বলা। উপভোক্তাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে তৃণমূল সরকারের গুণগান করার লক্ষ্যই ছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বলার চেয়ে নেতাদের শুনতে হচ্ছে বেশি। সাধারণ মানুষ স্থানীয় সমস্যার কথা বলতে গিয়ে বড়ো নেতা, বিধায়ক, সাংসদদের কাছে স্থানীয় নেতাদের সম্পর্কে নালিশ করছেন। সুযোগ কাজে লাগানোর এই তাগিদই অনেক ক্ষেত্রে ক্ষোভ-বিক্ষোভের চেহারা নিচ্ছে। পঞ্চায়েত স্তরের অভিযোগ উচ্চ নেতৃত্বকে জানানোর ক্ষেত্র হিসেবে এই কর্মসূচিকে বেছে নিচ্ছেন অনেক তৃণমূল স্তরের তৃণমূলকর্মীও। আবার পঞ্চায়েতকে বলে বলেও কোনও পরিষেবা না পাওয়া নিয়েও সাধারণ মানুষ মুখ খুলছেন। আবার আবাস যোজনা নিয়েও পাওয়া বা না পাওয়ার অভিযোগ বিস্তর।

> জোকা ইএসআই হাসপাতালে পার্থকে যে মহিলা জুতো ছুড়ে মারলেন, তিনি কি আগে সেটা করার কথা ভাবতে পারতেন? আগে যাঁরা সব দেখেও চুপ থাকতেন, তাঁরা এখন সরব।

পঞ্চায়েত থেকে জেলা স্তরের সেই নেতাদের সম্পত্তি বৃদ্ধি নিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষোভ রয়েছে। সাধারণ কর্মী ও মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগও রয়েছে। কলকাতার দলীয় নেতৃত্ব সেই নেতাদের সম্পর্কে যতটা জানেন, তার চেয়ে বেশি জানে স্থানীয়েরা। সে সব সামনে এসে যাচ্ছে। কিন্তু দিদি, আমার ভয় করছে অন্য কারণে। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রেপ্তার হওয়া, শিক্ষায় দুর্নীতি নিয়ে ঘটতে থাকা ঘটনাপ্রবাহে গত কয়েক মাসে তৃণমূলের ভবমূর্তি বদলে গিয়েছে সাধারণ মানুষের কাছে। টেট, স্লেট পরীক্ষা-সহ শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির যে ছবি এখনও পর্যন্ত প্রচারে এসেছে, তা নিয়ে গোটা রাজ্যই ক্ষুব্ধ। মন্ত্রী পার্থর বিরুদ্ধে তদন্তে নেমে বিপুল অর্থ উদ্ধার। এভাবে ঘরের ভিতর নোটের পাহাড় বানিয়ে রাখার ছবি আগে দেখেনি এ রাজ্য। সম্প্রতি তৃণমূল বিধায়ক জাকির হোসেনের বাড়ি থেকে বড়ো অঙ্কের নগদ উদ্ধার ভোটারদের তাঁদের প্রতি আরও বিরূপ করে তুলতে পারে বলে দলের একাংশের আশঙ্কা।

আসলে দিদি, তৃণমূল নামক হাতিটা কাদায় পড়েছে। মনে রাখবেন, হাতি যখন কাদায় পড়ে, চামচিকেতেও লাথি মারে। জোকা ইএসআই হাসপাতালে পার্থকে যে মহিলা জুতো ছুড়ে মারলেন, তিনি কি আগে সেটা করার কথা ভাবতে পারতেন? আগে যাঁরা সব দেখেও চুপ থাকতেন, তাঁরা এখন সরব। শাসকের প্রতি 'ভয়ভক্তি' কমেছে, কমছে। বীরভূম জেলায় সাংসদ শতাব্দী রায় বা বাকিদের যে হেনস্থা হতে হয়েছে, সেটা অনুব্রত মণ্ডল স্বমহিমায় নিজের জেলায় উপস্থিত থাকলে সম্ভব হতো কি দিদি! আপনিই বলুন। □

অতিথি কলম

রাম মাধব

মুসলমানদের নিয়ে সরসঙ্ঘচালকজীর বক্তব্যের অপব্যাখ্যা কাম্য নয়

একই শব্দ ক্ষেত্র বিশেষে এবং ব্যক্তি বিশেষে ভিন্নার্থ ধারণ করে। এর পেছনে অধিকাংশ সময়ই থাকে পূর্ব লালিত নির্দিষ্ট ধারণা বা সংস্কার, মোহনজীর সাম্প্রতিক একটি সাক্ষাৎকার থেকে বেছে বেছে তাঁর মুসলমানদের পূর্বতন ভারত শাসকদের মানসিকতা ঝেড়ে ফেলার প্রসঙ্গটি নিয়ে অকারণ তোলপাড় শুরু হয়েছে। অনেকেই দীর্ঘ বিশ্লেষণটির সঠিক পরিপ্রেক্ষিত বিশ্লেষণ না করেই মতামত ছুঁড়ে দিয়েছেন।

বাস্তবে সাক্ষাৎকারটি ছিল দীর্ঘ এবং সমগ্র ভারতের পটভূমিতে বিভিন্ন জনবিন্যাসের আচরণ ও আরও বহুবিধ বিষয় নিয়ে। যে কারণে দেশের ভবিষ্যতের নিরিখে এটি ছিল দূরদর্শী। কিন্তু চিরকাল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ভূমিকাকে নিন্দনীয় হিসেবে দেখিয়ে যারা আত্মপ্রসাদ অনুভব করে তারা ঝাড়াই বাছাই করেছে। প্রখ্যাত মার্কিনি লেখক ওয়ালটার অ্যান্ডারসন একবার লিখেছিলেন 'the RSS is difficult to understand and easy to misunderstand' এই ভুল ঘোষণাটির উৎপত্তি কিন্তু স্বতঃপ্রণোদিতভাবে ঘটনাকে বিকৃত করার মানসিকতা। আবার অনেক সময়ই সঙ্ঘের তরফ থেকে ঘটনার স্বরূপের প্রকৃত ব্যাখ্যাটির যথাযথ প্রচার না হওয়ার খামতি। আলোচ্য সাক্ষাৎকারটি বিতর্কিত করার ক্ষেত্রে প্রধান কারণ এটি ছিল দীর্ঘ ও হিন্দি ভাষায়। তাই সমালোচকদের অধিকাংশই এর পুরোটা পড়েননি বা পড়া প্রয়োজন মনে করেননি। সাক্ষাৎকারটি বেরিয়েছিল হিন্দি পাঞ্চজন্যে। কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল সঙ্গে একটি ইংরেজি অনুবাদ আলাদাভাবে জুড়ে দেওয়া যাতে উৎসুক সমালোচকরা আজকের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী সংগঠনটির দৃষ্টিভঙ্গির সঠিক হদিশ পায়।

মনে রাখা দরকার, সঙ্ঘ কোনো ফসিল হয়ে যাওয়া সংগঠন নয়। স্বাধীনতার পর তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজী (এমএস গোলওয়ালকর) অনেক নতুন সংগঠন, রীতি নীতির প্রচলন করেন। রাজনীতির লোকেরা যাকে আজ সঙ্ঘ পরিবার বলে থাকেন। বালাসাহেব দেওরস, রাজেন্দ্র সিংহ বা কে এস সুদর্শনের মতো পরবর্তী সরসঙ্ঘচালকরাও সঙ্ঘের কাজের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের বহু ধারা তৈরি করে দেন।

আজকের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত সেই পরিবর্তনশীল ধারাকেই আরও বিস্তারিত লক্ষ্যে অগ্রসর করাতে চাইছেন এবং আরও খোলামেলাভাবে। আগেকার প্রচারবিমুখ এবং যথেষ্ট অন্তর্মুখী সংগঠন থেকে আজকের সারা বিশ্বের সঙ্গে সমসাময়িক যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধারা ও চর্চার বিষয় উঠে আসছে তার প্রত্যেকটি নিয়েই সারা বিশ্বের সঙ্গে মত বিনিময়ে সর্বাপেক্ষা তৎপর এই সংগঠন। যেমন সমকামী সম্পর্কের মতো বিতর্কিত বিষয়।

সঙ্ঘ রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ কখনই ঘনিষ্ঠ করবে না। কিন্তু মানুষের অসুবিধে, প্রয়োজন ও উৎকণ্ঠার সময় রাজনৈতিক ক্ষমতায় থাকা স্বয়ংসেবকরা তাদের কাছে পৌঁছে যাবে অবশ্যই।

এই সাক্ষাৎকারে মোহনরাও ভাগবত অত্যন্ত খোলামেলাভাবে এ বিষয়ে বিচার রেখেছেন। একবিংশ শতকের গোড়ার দিকে সংগঠনের মুখপাত্র হিসেবে আমি একবার বলেছিলাম যে সমস্ত যৌন ক্রিয়াকর্ম প্রথাসিদ্ধ ও দীর্ঘদিন গৃহীত প্রাকৃতিক অভ্যাস হিসেবে ধরে নেওয়া হয়, তার ব্যত্যয় হলেই (সমকামিতা) পূর্বতন ইংরেজ শাসকের প্রবর্তিত কড়া অপরাধমূলক আইনের পুনর্বিবেচনা করা হোক। এর পরবর্তী বেশ কিছু বছর ধরে সঙ্ঘের তরফে এই বিষয়ের পক্ষে কড়া অবস্থান নেওয়া হয়। এবং সংগঠন সম্পাদক (সরকার্যবাহ) দত্তাত্রেয় হোসবালে একটি মিডিয়া সাক্ষাৎকারে ২০১৬ সালে দৃঢ় ভাবে বলেন 'I do not think homoscxuality should be considered a criminal offence'। লক্ষ্য করুন, এর দু'বছর পরে ২০১৮ সালেই সর্বোচ্চ আদালত এই শাস্তি সংক্রান্ত আইপিসি-র ৩৭৭ ধারা বাতিল করে সমকামিতাকে অপরাধমূলক তালিকা থেকে বাদ দেয়।

তাঁর এই সাম্প্রতিকতম সাক্ষাৎকারে শ্রীভাগবত এই বিতর্ককে আরও প্রসারিত করে বলেন সমকামিতা একটি বায়োলজিক্যাল বিষয় এবং সেই কারণে সমকামীরা আদৌ সমাজে কোনো সমস্যা নয়। একই সঙ্গে তিনি বলেছেন এরা সমাজের অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ, এরা রীতি নীতির সঙ্গে যথাযথ পরিচিত। এই সূত্রে তিনি মহাভারতের উল্লেখ করে বলেন সমকামীদের অস্তিত্ব সামগ্রিক মনুষ্যসমাজের অস্তিত্বের সঙ্গে সমান্তরাল। এটি আদৌ আজগুবি নয়। তিনি দাবি করেন এই সমকামী বা LGBTQ-কে তাদের নিজস্ব পরিসর অবশ্যই দেওয়া উচিত। একই সঙ্গে তারা যে আমাদের সমাজেরই অঙ্গ, একথা যেন তারা অনুভব করতে পারে। তবে এই নিয়ে অনাবশ্যক আন্দোলন, তোলপাড় করে দেওয়া মোটেই অভিপ্রেত নয়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রশ্নেও মোহনরাও ভাগবত সর্বাপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত পথই অবলম্বন করেছেন। তিনি এই সমস্যা নিয়ে সরাসরি সমাজের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধির আবেদন জানান। সঙ্গে সঙ্গে আইন প্রণয়ন বা নিয়ন্ত্রণবিধি তৈরির প্রসঙ্গে জোর দেননি। আমরা সকলেই জানি যে সমগ্র হিন্দু সমাজের মধ্যেই জনবিন্যাস নিয়ে একটা অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছে। শেষ রিপোর্ট অনুযায়ী মুসলমান মহিলাদের প্রজনন হার কমেছে। এই প্রসঙ্গে তিনি বিশদে বলেন, মুসলমানদের ভারতবর্ষে বাস করা নিয়ে বিন্দুমাত্র ভয়ের কারণ নেই। তিনি বলেন 'simple truth is this Hindusthan should remain Hindusthan'। মুসলমানরা যেমন আজকের ভারতে নিজেদের বিশ্বাস নিয়ে জীবনযাপন করছেন ঠিক সেই ভাবেই তারা কাটিয়ে যেতে পারবেন। কিন্তু তাদের ভারতের অতীত শাসক হিসেবে, উচ্চতর প্রজাতির মানুষ হিসেবে নিজেদের জাহির করার প্রবণতা পরিত্যাগ করতে হবে। নজর করলেই দেখা যাবে, হিন্দু সমাজ গত ১০০০ হাজার বছর ধরেই এক যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে। বিভিন্ন বিদেশি আক্রমণের মুখে পড়েছে। এর মধ্যে শুধু সশস্ত্র যুদ্ধ নয়, বিদেশি সাংস্কৃতিক প্রভাব ও বহু চক্রান্তের শিকার দেশকে হতে হয়েছে। সঙ্ঘ এই ক্ষেত্রেও দেশকে সশক্ত করতে সর্বদা সক্রিয় থেকেছে। অনেকেই দেশের এই পরিস্থিতি নিয়ে প্রতিবাদ করেছে, তাই আজ হিন্দুদের মধ্যে একটা পুনরুত্থান দেখা যাচ্ছে। তিনি বলেছেন আজকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশ মুক্ত থাকলেও অভ্যন্তরীণ কিছু শক্তি হিন্দুদের বিরুদ্ধে লড়ছে। এই কারণেই হিন্দু সংস্কৃতি, ধর্ম, সমাজকে সদা প্রতিরোধ করতে হচ্ছে। আজ বিদেশি আক্রমণকারী নেই। কিন্তু বিদেশি প্রভাব ও চক্রান্ত সক্রিয় রয়েছে। এই পরিবেশের জন্যই ব্যথিত মানুষ অনেক সময়ই প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠছে। প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে তিনি জানান মুসলমানরা তাদের বিশ্বাস ও ধর্মাচরণে স্থিত থাকুন কিন্তু অতীত আক্রমণ ও বিজয়ের তত্ত্ব জাহির করে সামগ্রিক সামাজিক পরিবেশে কোনো আধিপত্যবাদ প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা করবেন না। এর পরই অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, সঙ্ঘ সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠন হিসেবে সরাসরি রাজনৈতিক সংস্রবের পথে কেন অগ্রসর হচ্ছে? সঙ্ঘ বরাবরই রাজনৈতিক সংস্রবের বাইরে থাকাই পছন্দ করে। কিন্তু যখন দেখা যায় নির্দিষ্ট ধরনের রাজনীতি আমাদের 'national policies, national interest and Hindu interest'-এর ক্ষতি করছে তখন হিন্দুস্থানে থেকে হিন্দু স্বার্থবিরুদ্ধ কিছু করাকে সঙ্ঘ কখনই বরদাস্ত করবে না।

হ্যাঁ, অতীতের সঙ্গে আজকের একটি গুণগত তফাত অবশ্যই আছে। প্রথমদিকের স্বয়ংসেবকরা কখনই রাজনৈতিক ক্ষমতায় আসীন হননি। স্বয়ংসেবকদের ক্ষেত্রে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে এইটুকুই যা পরিবর্তন। মানুষ কিন্তু ভুলে যাচ্ছে যে স্বয়ংসেবকদের এই ক্ষমতা তাদের সংগঠনের মাধ্যমেই ঘটেছে। সঙ্ঘ কিন্তু বরাবরের মতোই সমাজকে সঙ্ঘটিত করে চলেছে। শুধুমাত্র সংগঠন তৈরি করার উদ্দেশ্যেই। কিন্তু মজার কথা, স্বয়ংসেবকরা রাজনীতিতে যোগ দিয়ে যা কিছু ভুল বা বিচ্যুতিই করুক না কেন তার সঙ্গে সরাসরি সঙ্ঘকেই দায়ী করা হয়। অনেক সময় সরাসরি দায়ী না করা হলেও বলা হয় এরা আদতে তো সেই সঙ্ঘেই প্রশিক্ষিত হয়েছে। এই কারণেই আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করতে হয় যে রাজনীতিতে কাজ করা স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কেমন হবে অর্থাৎ তাদের কাজের মাধ্যমে জাতীয় মঙ্গল কতটা সাধিত হচ্ছে আর সেই কাজ তারা কতটা নিষ্ঠার সঙ্গে করছেন।

তিনি এও বলেছেন, সঙ্ঘ রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ কখনই ঘনিষ্ঠ করবে না। কিন্তু মানুষের অসুবিধে, প্রয়োজন ও উৎকণ্ঠার সময় রাজনৈতিক ক্ষমতায় থাকা স্বয়ংসেবকরা তাদের কাছে পৌঁছে যাবে অবশ্যই। ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে মোহনরাও ভাগবতজীর আলোচনায় উঠে এসেছে যদি আমরা আমাদের উৎপাদনের পরিসরকে বিকেন্দ্রীভূত করতে পারি সেক্ষেত্রে আমাদের উৎপাদনের বিপুল বৃদ্ধি হবে। কিন্তু এই বিপুল পণ্য বিক্রি করতে গিয়ে আমরা যেন ভোগবাদকে প্রশ্রয় না দিতে থাকি। যদি উপভোক্তার সংখ্যা কম থাকে বস্তুর দামও নাগালের মধ্যে থাকবে। পশ্চিমকে অনুসরণ করে চূড়ান্ত ভোগবাদ আমাদের সমাজে খাপ খাবে না।

তাঁর কথায় 'আত্মনির্ভর' কথার অর্থ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হওয়া নয়। এর অর্থ ব্যবসাবাণিজ্যে নতুন প্রগতি যা আমাদের জাগতিক সুখ নিরাপত্তার সঙ্গে ভবিষ্যৎ নিশ্চিন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি দেবে। হিন্দুস্থানে থাকবে শান্তি ও তৃপ্তির বাতাবরণ। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্যাস হলো মোহরাও ভাগবত যে হাজার বছর যুদ্ধের প্রসঙ্গ বলেছেন, তার বীজ রয়েছে UNESCO-র প্রধান সূত্রে 'যুদ্ধের উদ্ভব হয় মানুষের মনে'। মোহন ভাগবতজী সেই সূতিকাগারেই বদল আনতে চেয়েছেন।

শোকসংবাদ

মালদা জেলার গাজোল খণ্ডের মাঝড়া শাখার কার্যবাহ বনমালী মণ্ডলের মাতৃদেবী সারথী মণ্ডল গত ৩ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১১০ বছর। তিনি ২ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

মালদা জেলার গাজোল বিবেকানন্দ শাখার স্বয়ংসেবক লক্ষ্মীরাম টুডু গত ১ জানুয়ারি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগণন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। উল্লেখ্য, তিনি দীর্ঘদিন বনবাসী কল্যাণ আশ্রম উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সহ-সভাপতির দায়িত্ব পলন করেছেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের গাজোল প্রখণ্ডের দায়িত্ব পালন করেছেন। অকৃতদার শ্রীটুডু ৪ ভাই, ১ বোন এবং অসংখ্য গুণমুগ্ধ বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

প্রশ্নের মুখে পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক পরিবেশ

প্রতিটি ভারতবাসীর কাছে ২৬ জানুয়ারির তাৎপর্য অপরিসীম। ভারতীয় শিশুরাও জানে ওই দিনটির গুরুত্ব। কারণ আমরা স্কুলে পড়ে এসেছি, ২৬ জানুয়ারি স্বাধীন ভারতের সংবিধান ঘোষিত হয়। তাই দিনটি সাধারণতন্ত্র বা গণতন্ত্র দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু এ প্রশ্ন আমাদের মনে সততই জাগে যে এই দিনের মূল্য কি নেহাতই এক বিশেষ দিনের? ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হলেও তখনো পর্যন্ত ভারতবর্ষ ইংল্যান্ডের রাজা ষষ্ঠ জর্জের শাসনাধীনে এবং তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে গভর্নর জেনারেল রূপে তখনো ছড়ি ঘোরাচ্ছেন মাউন্টব্যাটেন। ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি পরাধীন দেশে পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্প ঘোষিত হয়েছিল, তারপর সেই ঐতিহাসিক দিনের স্মরণে নানা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে স্বাধীন ভারতের গণপরিষদের সদস্যদের উদ্যোগে ওইদিন ভারতের সংবিধান কার্যকর হয়। গণতান্ত্রিক ভারত আত্মপ্রকাশ করে। স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশরূপে ভারতবর্ষের কাছে এই দিনটির বিশেষ তাৎপর্য আছে।

স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছরে দেশের গণতন্ত্র যে কলুষিত হয়নি তা নয়। ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থা জারি নিঃসন্দেহে ভারতের মহান গণতন্ত্রকে কলুষিত করেছে। তাঁর আমলেই সংবিধানে 'সেকুলার' শব্দটি আমদানি করে হিন্দুদের বঞ্চনার যে পথ প্রশস্ত হয়েছিল, তাও দেশের সার্বভৌমিকতা ও গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক। সেকুলার শব্দটিকে হাতিয়ার করে হিন্দুদের প্রতি দেশীয় প্রশাসনের বঞ্চনার মধ্য দিয়ে আমাদের মহান গণতন্ত্রের ভাবনাকেই কলুষিত করে।

পশ্চিমবঙ্গের শাসন ক্ষমতায় সবচেয়ে দীর্ঘ সময়ে আসীন বামফ্রন্টের আমলেই সংবিধানের সেকুলার শব্দটিকে হাতিয়ার করে সংখ্যালঘু অধিকারের নামে মুসলমান তোষণ শুরু হয়েছিল। আর বর্তমান তৃণমূল সরকারের আমলে তা শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা শুধু পূর্ব ভারতের খুব গুরুত্বপূর্ণ শহর অথবা প্রবেশদ্বারই নয়, তা সমগ্র ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানীও বটে। তাই স্বাভাবিকভাবে এই রাজ্য ও এই শহর দেশের গণতন্ত্র রক্ষায় অগ্রগণ্য ভূমিকা নেবে, এটাই কাম্য ছিল। কিন্তু বিগত অর্ধশতাব্দী ধরে এখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি আমরা দেখেছি। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ছিলেন ইন্দিরার জরুরি অবস্থা জারির প্রধান পরামর্শদাতা। সেই সময় দেশে তো বটেই, এ রাজ্যেও প্রতিবাদীদের জেলে ভরে, তাদের ওপর নির্মম অত্যাচার করে। সাংবাদিকরা ও সংবাদপত্রও এই অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পায়নি, গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভকে শ্মশানে পাঠিয়ে গণতন্ত্র শব্দটিকে রীতিমতো প্রহসনে পরিণত করে ১৯৭২ সালে গায়ের জোর দেখিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল কংগ্রেস, মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। তারও আগে আমরা দেখেছি, সিপিআইএমের সমর্থনে যুক্তফ্রন্ট সরকারের অসহায় মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায়কে। যিনি তাঁর সরকারেরই অসহযোগিতার বিরুদ্ধে আন্দোলনে বসেছিলেন। এও দেশের গণতন্ত্রের পক্ষে শুভ বিজ্ঞাপন ছিল না। এরও পূর্বে আমরা দেখেছি, এক আনা ভাড়া বৃদ্ধির জন্য বহু ট্রাম জ্বালিয়ে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করা। পরে তারাই ক্ষমতায় এসে একের পর এক বীভৎস গণহত্যা সংগঠিত করে, শ্রমিক ইউনিয়নের নামে একের পর এক কলকারখানা বন্ধ করে দিয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্মকে বেকারত্বের জ্বালা দিয়ে পার্টি করতে বাধ্য করে, ভোটের নামে প্রহসন, যাকে সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্ত 'বৈজ্ঞানিক রিগিং' আখ্যা দিয়েছিলেন, ভয়াবহ সেই অত্যাচারের কথা আংশিকভাবে লিখেছিলেন সাংবাদিক নাম্বুদিরিপাদ তাঁর 'বেঙ্গলস নাইট উইদাউট এন্ড' বইতে; বাম আমল রাজ্যের গণতন্ত্রের পক্ষে সত্যিই বিভীষিকা, চরম লজ্জারও।

দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর বাদে এই অবস্থা থেকে মুক্তির জন্যই রাজ্যের মানুষ ক্ষমতায় এনেছিল তৃণমূলকে। তার এগারো বছর বাদে কী দেখা যাচ্ছে? পাহাড়-প্রমাণ দুর্নীতিতে নিমগ্ন রাজ্যের শাসকদলের নেতামন্ত্রীরা। যোগ্য ও সৎ প্রার্থীদের বঞ্চিত করে, ঘুষের বিনিময়ে বস্তা বস্তা কালোটাকা উদ্ধার হচ্ছে, বিচারপতিরা তার বিরুদ্ধে রায় দিতে গিলেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ শাসকের হুমকির স্বীকার হচ্ছেন, কলকাতা হাইকোর্টের প্রবীণ বিচারপতি রাজকুমার মান্থার বিরুদ্ধে পোস্টার দিয়ে বিচারব্যবস্থাকে ভয় দেখানো হচ্ছে। ঠিক যেমন বাম আমলে বিচারপতি অমিতাভ লালার বিরুদ্ধে একই কায়দায় স্লোগান তুলে ভয় দেখানো হয়েছিল, 'লালা বাংলা ছেড়ে পালা', গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ অর্থাৎ সংবাদমাধ্যমকেও প্রায় পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছে।

এ রাজ্যে বিরোধী রাজনৈতিক দলকে সম্মান প্রদর্শন বহুদিনই অদৃশ্য। বাম আমলেও তার রেওয়াজ ছিল না, এখন তো নেইই। ২০১৮-র পঞ্চায়েত নির্বাচন, ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের পর সন্ত্রাস-বাম আমলকেও টেক্কা দিয়েছে বর্তমান আমল। শুধু বর্তমান শাসকদলকে একটাই কথা মনে করিয়ে দেওয়ার যে, ইতিহাসের বিচার কিন্তু বড়োই নির্মম। এককালের শাসকদল, পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বহুকাল শাসক-বিরোধী সিপিএম-কংগ্রেস কিন্তু আজ পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় আজ অস্তিত্বহীন হয়ে তারা অতীত ভুলের মাশুল দিচ্ছে। আর পশ্চিমবঙ্গের ভোটারদের কাছে দেশের ৭৪তম সাধারণতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে জিজ্ঞাস্য, এই গণতান্ত্রিক পরিবেশই কি আপনারা চেয়েছিলেন? ভাবা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গবাসীকে প্র্যাকটিশ করতেই হবে, অন্তত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের স্বার্থে। □

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আজও ভারতবাসীর হৃদয়ে অমলিন

মনীন্দ্রনাথ সাহা

গত বছর ৮ সেপ্টেম্বর এক ঐতিহাসিক মূহূর্তের সাক্ষী থেকেছে গোটা দেশ। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পর দিল্লিতে ইন্ডিয়া গেটে স্থাপিত হয়েছে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ৬৫ টন ওজনের ২৮ ফুট উঁচু গ্রানাইট পাথরের মূর্তি। এতদিন ইতিহাসে শুধু একটি পরিবারের মহত্ত্বের কথাই পড়ানো হয়েছে। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা অন্যান্য দেশের মতো কোনও একটি পরিবারের জন্য আসেনি বা চরকায় সূতা কেটেও আসেনি। দেশের স্বাধীনতা এসেছে বহু বীর সন্তানের আত্মবলিদানের মাধ্যমে। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে তাঁদের কথা সামনে আনা হয়নি। সে রকমই এক বীর বিপ্লবী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অনেক অজানা কথাও আমাদের জানতে দেওয়া হয়নি। স্বাধীনতার পর থেকেই উপেক্ষিত হয়েছিলেন তিনি।

সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই ১৯২০ সালের জুলাই মাসে লন্ডনে আইসিএস পরীক্ষায় চতুর্থ হলেন মেধাবী সুভাষ। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের অধীনে চাকরির প্রস্তাব ঘৃণাভরে ত্যাগ করলেন। যখন দাদাকে চিঠি লিখে জানালেন তিনি আইসিএস হবেন না, তখন বাঙ্গালিকে তা উদ্বেলিত করেছিল। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক অমলেন্দু দে লিখেছেন, 'অতবড়ো লোভনীয় একটি পদ পরিত্যাগ করলেন তিনি দেশের স্বার্থে। এটা বাঙালি আত্মত্যাগের মাধ্যমে দেশসেবা করার যে আদর্শ তুলে ধরেছিল, যার জন্য অগণিত লোক আন্দামানে নির্বাসন বেছে নিয়েছিলেন, সেই ধারাটিকে আরও প্রজ্বলিত করলেন সুভাষ বসু।' তিনি মনে করতেন ভারতের হৃতগৌরব তা বাঙ্গালিদেরই ফিরিয়ে আনতে হবে।

অন্তর্কলহে জর্জরিত বাঙ্গালি সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র লিখেছেন, 'অধঃপতন আর কতদূর গড়াবে তা শুধু ভগবানই জানেন। বাঙ্গালি নিজেকে সস্তাদরে বিক্রয় করে এক গালে চুন আর এক গালে কালি মেখে বসে আছে। বাঙ্গালির অধঃপতন চরমে পৌঁছতে আর কত দেরি আছে তা আমরা জানি না। কে জানে কত দুঃখ, কত লজ্জা বাঙ্গালির কপালে আছে? এখনও সময় আছে তার প্রতিকার করার। বাঙ্গালির গৌরব পুনরুদ্ধার করতে হবে। নিখিল ভারতীয় কাজে বাঙ্গালির যে স্থান ছিল সে স্থান ফিরে পেতে হবে। পরিবর্তন বিরোধীরা বাঙ্গালির নাম ভারতের সম্মুখে কলঙ্কিত করেছেন, এ কলঙ্ক আমাদের ঘোচাতে হবে। ভারতকে যেমন বাঁচাতে হবে, বাঙ্গলার নামও সেরূপ চিরকালের জন্য উজ্জ্বল রাখতে হবে। বাঙ্গলার নষ্ট খ্যাতি ও লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের কাজে যিনি সহায়তা করবেন বাঙ্গালি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।' এই কথাগুলো কিন্তু আজকের দিনেও সমান প্রাসঙ্গিক।

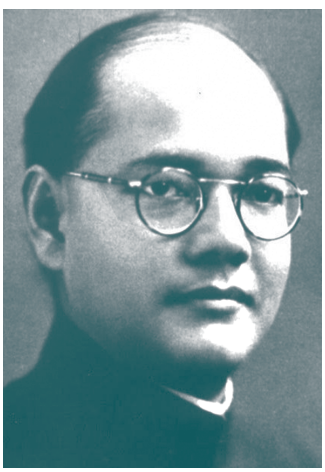

ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে যতদিন না নেতাজীর সংগ্রাম, চরিত্রশক্তি, নিঃস্বার্থপরতা, মানবিকতা, প্রাণময়তা ও অভিজ্ঞতাকে আমরা মূলধন করবো ততদিন তাঁর আত্মার শান্তি নেই।

একসময় বাঙ্গালি জাতির উদ্দেশে তাঁর আহ্বান ছিল—''....বঙ্গ জননী একদল তরুণ নবীন সন্ন্যাসী চান।.... তোমরা সকলে এসো, ভ্রাতৃবন্ধনের 'রাখি' পরিধান করে মায়ের মন্দিরে দীক্ষা নিয়ে আজ এই প্রতিজ্ঞা করো যে, মায়ের কালিমা তোমরা ঘোচাবে। ভারতকে আবার স্বাধীনতার সিংহাসনে বসাবে এবং হৃতসর্বস্ব ভারতলক্ষ্মীর লুপ্ত গৌরব ও সৌন্দর্য পুনরুদ্ধার করবে।' এহেন প্রণম্য দেশনায়ক তথা বাঙ্গালির চিরকালের আইকন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মবছর সাম্প্রতিক অতীতে বিপুল উদ্যমে পালিত হয়েছে।

অনেকেই হয়তো বিশ্বাস করবেন না বা গল্পকথা বলে উড়িয়ে দেবেন, কলকাতায় ৫২ জন ব্রিটিশ পুলিশের নজর এড়িয়ে এলগিন রোডের বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হওয়ার পর থেকেই ব্রিটিশ সরকারের অবিরাম চেষ্টা ছিল সুভাষ কোনো বিদেশি শক্তির কাছে পৌঁছানোর আগেই তাকে খুন করে লাশ গায়েব করে দেওয়ার। এবং প্রবল

চেষ্টা করা হয়েছিল যাতে কাবুলের মাটিতেই তাঁর কফিনে শেষ পেরেকটা পুঁতে দেওয়া যায়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং নেতাজী বিষয়ক তথ্যের ভাণ্ডারে এক গুরুত্বপূর্ণ ষড়যন্ত্রের নেপথ্যে অপ্রত্যক্ষভাবে হলেও যে বড়ো ধরনের কংগ্রেস-কমিউনিস্ট আঁতাতের হাত ছিল তারও প্রমাণ মিলেছে। কেউ সন্দেহ পোষণ করলেও ব্রিটিশ সরকারের এই ষড়যন্ত্রের নামকরণ হয়েছিল—Operation Liquidate Netaji–অপারেশন নেতাজী হত্যা।

সংবাদমাধ্যম থেকে আরও জানা গেছে, ট্রিনিটি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ইউনান ও হালপিন তাঁর 'আয়ারল্যান্ড ইউনাইটেড কিংডম' বিষয়ক গবেষণার সময় তুরস্কের মহাফেজখানায় সংরক্ষিত একটি গোপন নথির সন্ধান পান। সময়টা ২০০৫ সাল। সেই গোপন নথিটি ছিল ইউনাইটেড কিংডম হোম ডিপার্টমেন্ট তথা ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র বিভাগের একটি গোপন সার্কুলার তথা ব্রিটিশ সরকারের গোপন গোয়েন্দাবাহিনীর স্পেশাল অপারেশনস এক্সিকিউটিভ (SOE)-কে পাঠানো একটি রেডিয়ো মেসেজ, যাতে বলা ছিল—'ভারতবর্ষের সুভাষচন্দ্র বোস গোপনে কায়রো-ইস্তাম্বুলের পথে চলেছেন শত্রুদেশ জার্মানির উদ্দেশে। তাকে যেখানেই পাও, হত্যা কর।' Liquidate him —নির্দেশটি পাঠানোর তারিখ ৭ মার্চ ১৯৪১। ঠিক এর কয়েকদিন আগে ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১-এ পাঠানো হয়েছিল একই নির্দেশ। পরপর দু'বার।

নেতাজী জাপানি সহায়তায় আজাদ হিন্দ বাহিনী নিয়ে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ব্রিটিশ দখলে থাকা এলাকায় ব্রিটিশ বাহিনীকে আঘাত হানলেন এবং অনেক এলাকা দখল করতে করতে ভারতের সীমানায় পৌঁছে গেলেন। কোহিমা, ইম্ফল দখল করে নেয় আজাদহিন্দ বাহিনী। ১৯৪৩ সালের ১১ অক্টোবর 'স্বাধীন আজাদ হিন্দ সরকার' প্রতিষ্ঠা করা হয় নেতাজীর নেতৃত্বে। জাপানিরা আগেই আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ব্রিটিশদের কাছ থেকে দখল করে নিয়েছিল। জাপান সরকার এই দ্বীপগুলি আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে অর্পণ করে। নেতাজী এদের নাম দিয়েছিলেন 'শহিদ' ও 'স্বরাজ' দ্বীপ। বিশ্বের ১১টি দেশ আজাদ হিন্দ সরকারকে স্বাধীন সরকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। ওই দেশগুলিতে আজাদহিন্দ সরকারের দূতাবাস স্থাপিত হয়েছিল এবং কারেন্সিও ছাপা হয়েছিল।

১৯৪৪ সালের মে মাস থেকে জাপানিরা পরাজিত হতে থাকে। মিত্রপক্ষের শরিক আমেরিকা সারা পৃথিবীকে স্তম্ভিত করে ১৯৪৫ সালের ৬ ও ৯ আগস্ট জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা নিক্ষেপ করে। ১৯৪৫ সালের ১৫ আগস্ট জাপান পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করে মিত্রশক্তির কাছে। স্বাভাবিক ভাবেই আজাদ হিন্দ বাহিনীর যারা জাপানের সহায়তায় লড়ছিল তাদেরও আত্মসমর্পণ করতে হয়। ঠিক হলো নেতাজী সুভাষচন্দ্র আবারও আত্মগোপন করবেন।

তাঁর আত্মগোপনের পর তাঁর আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। ব্রিটিশ রেডিয়ো প্রচার করে ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট জাপানের টোকিয়ো যাওয়ার পথে তাইওয়ানের তাইহোকুতে বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বিচারপতি মনোজ মুখার্জি কমিশনের (১৯৯৯-২০০৫) মতে ১৮ আগস্ট বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুর কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অনেকেই মনে করেন নেতাজীর মৃত্যু রহস্যের মধ্যে নেহরুর চক্রান্ত আছে। নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্যের সর্বজনগ্রাহ্য সমাধান এখনও হয়নি।

গান্ধী, নেহরু যতই ষড়যন্ত্র করুক না কেন একটা কথা দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়েছিল যে, আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিচারের অভিঘাতই ব্রিটিশকে ভারত ছাড়তে বাধ্য করেছিল এবং তার ফলে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। এই প্রসঙ্গে তদানীন্তন ভাইসরয় ওয়েভেল লিখেছিলেন, 'এই প্রথম একজন ব্রিটিশ বিরোধী রাজনীতিবিদ সেনাবাহিনীতে বিপুল প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হলেন আর তার ফল হলো সাংঘাতিক।'

মাইকেল এডওয়ার্ডস লিখেছিলেন, 'গান্ধীজী বা নেহরু ব্রিটিশ সরকারের কাছে তখন গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছিলেন। তাদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন বোস।' সুতরাং স্বাধীনোত্তর পর্বে নেতাজীকে ভারতের ইতিহাসে গুরুত্বহীন করে রাখার দায় জওহরলাল নেহরুর ওপরেই বর্তায়।

ইংল্যান্ডে গিয়ে মাত্র ৮ মাস পড়াশোনা করে আইসিএস পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। কিন্তু মানসিকভাবে সন্তুষ্ট হলেন না। বিলেতে একের পর এক ডিগ্রি নিলেও অন্তরে শান্তি পাচ্ছিলেন না। বারবার প্রশ্ন উঠছিল মনে, ইংরেজদের দাস হয়ে মোটা মাইনের চাকুরি আর নিশ্চিত আরামের জন্য জীবনের আদর্শকে বিসর্জন দেবেন? তাহলে তার আদর্শপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষার কোনো সার্থকতা থাকবে কি?

এদিকে ভারতবর্ষে তখন ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। বাঙ্গলায় স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। সুভাষচন্দ্রের মন থেকে সব সংশয় দ্বিধা দূর হয়ে গেল। তিনি যোগ দিলেন চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে।

১৯২১ সালে প্রিন্স অব ওয়েলেসের ভারত আগমন উপলক্ষ্যে দেশজুড়ে বিক্ষোভ শুরু হলো। হাজার হাজার প্রতিবাদী মানুষ কারারুদ্ধ হলেন। কারারুদ্ধ হলেন চিত্তরঞ্জন দাসও। তাঁর অনুপস্থিতিতে সুভাষচন্দ্রের ওপর পড়ল নেতৃত্বের ভার। সুভাষকেও বন্দি করা হলো। বিচারে ছয় মাসের কারাদণ্ড হলো। কারাদণ্ডের আদেশ শুনে সুভাষচন্দ্র মন্তব্য করেছিলেন—'এত কম শাস্তি! আমি কি মুরগি চুরি করেছি নাকি?'

এর কয়েক বছর পরে চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু হয়। ফলে বাঙ্গলার নেতৃত্বের ভার পড়ে সুভাষের ওপর। তিনি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে মানুষকে স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। ১৯২৯ সালে ছাত্র

সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে তাঁর বক্তব্য ছিল—'স্বাধীনতা শব্দের অর্থ সকলের কাছে এক নয়। আমাদের দেশেও স্বাধীনতা শব্দের মানের একটা ক্রমবিকাশ হচ্ছে। আমি স্বাধীনতা বলতে বুঝি সমাজ-ব্যক্তি, মেয়ে-পুরুষ, ধনী-গরিব সকলের জন্য স্বাধীনতা। এই রাজনৈতিক যুক্তির সঙ্গে সঙ্গে ঐশ্বর্যের সমবণ্টন। জাতিভেদ ও সামাজিক অবিচারের নাগপাশ থেকে নিষ্কৃতি এবং সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ও ধর্মের গোঁড়ামি থেকে উদ্ধার লাভ।'

নেহরু নেতাজীকে নিজের সবচেয়ে বড়ো প্রতিপক্ষ বলে মনে করতেন। তাই ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত গোয়েন্দা বিভাগ নেতাজীর পরিবারের উপর কড়া নজরদারি চালিয়েছে। এই সময়সীমার ১৬ বছরই প্রধানমন্ত্রী ছিলেন জওহরলাল নেহরু। এই গুপ্তচর বৃত্তির নির্দেশ যে নেহরু দিয়েছিলেন তা জলের মতো পরিষ্কার।

বিরুদ্ধবাদীরা নেতাজীর বিয়ের মুখরোচক গল্প বাজারে ছেড়ে তাঁর চরিত্র হননের চেষ্টা করেছিলেন। এ বিষয়ে বিখ্যাত সাহিত্যিক তথা সমালোচক নীরদ সি চৌধুরী বলেছিলেন— 'নেতাজীর মতো একজন ব্রহ্মচারী দেশনেতা একজন সাধারণ স্ত্রীর কাছে নিজেকে সমর্পণ করবে এ কখনই মেনে নেওয়া যায় না।' সুভাষ চন্দ্রের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত ১৯৯৬ সালে 'দেশ' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় তিনি লেখেন—''সুভাষচন্দ্র নারীর প্রেমে ব্রত ত্যাগ করিতে পারেন না। এই ধারণা তাঁহার বন্ধুদের মধ্যে কীরূপ দৃঢ় ছিল তাহা বুঝাইবার জন্য একটা কাহিনী বলি। তাহার ও আমার একজন সহপাঠী ও বন্ধু ছিলেন। সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে তাদের মধ্যে এরূপ আলাপ একদিন হইল। তিনি বলিলেন, ও পাগলাটাকে সারাবার একটাই মাত্র উপায় আছে। যদি কলকাতার কোনো প্রগলভা রূপসী ওকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বলাৎকার করে, তাহলে সে ধর্মবোধ থেকে তাকে বিয়ে করবে। তখন পাগলামি সেরে যাবে। অবশ্য এরোগ চিকিৎসার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। তবু আমি জানতাম অনেক বাঙ্গালি রূপসী তাহাকে পতিরূপে পাইলে নিজেদের ধন্য মনে করতেন। তিনি তাদের সংস্পর্শে আসিতেন বটে তবে কোনো দৃষ্টিপাত করিতেন না। সুভাষচন্দ্র জীবনে জার্মানিতে গতানুগতিক হইলেন আমার কাছে তা অবিশ্বাস্য হওয়াই স্বাভাবিক।"

জিডি খোসলা তাঁর লেখা—'Lost Days of Netaji' বইতে এমিলি ও অনিতাকে সুভাষের স্ত্রী ও কন্যা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু জি ডি খোসলার বিরুদ্ধে মামলা করেন। মামলায় তাঁর বক্তব্য ছিল, 'নেতাজী ছিলেন চির ব্রহ্মচারী, তিনি কোনদিন বিবাহ করতে পারেন না।' ফলে জি ডি খোসলা ও তার প্রকাশক ক্ষমা চেয়ে ওই কথাগুলি বই থেকে তুলে নিতে বাধ্য হয়।

নেতাজীর রাজনৈতিক সহকর্মী হেমেন্দ্রনাথ গুপ্ত নেতাজীর জীবনীতে লেখেন—'নেতাজী যখন ১৯৩৭ সালে করাচি বিমানবন্দরে উপস্থিত হন তখন তাঁকে তাঁর বিবাহ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি স্পষ্ট বলেছিলেন—'ওসব নিয়ে ভাবনা চিন্তা করার সময় আমার নেই।'

স্বামীজীর বাণীকে মন্ত্ররূপে জীবনে গ্রহণ করেছিলেন সুভাষ এবং নিজেকে সম্পূর্ণরূপে দেশোদ্ধারের কাজে সমর্পণ করেছিলেন। দাসত্ব, অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে বিদ্রোহ করতে আহ্বান জানিয়ে সুভাষ বলেছিলেন—''ভুলো না, মানুষের সবচেয়ে বড় অভিশাপ গোলাম হয়ে বেঁচে থাকা। ভুলো না, জঘন্যতম অপরাধ হলো অন্যায় ও অবিচারের সঙ্গে আপোশ করা। মনে রেখো, শাশ্বত সেই বিধান, জীবনে যদি পেতে চাও, জীবন তাহলে দিতে হবে। মনে রেখো, শ্রেষ্ঠ ধর্ম অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, তার জন্য যতই মূল্য দিতে হোক।"

বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর সাজানো মৃত্যুকে নিয়ে তো এখনও চলছে চক্রান্ত। জওহরলালের ইচ্ছায় নেতাজীর মৃত্যুরহস্য উদ্ঘাটনে গঠিত হয় শাহনওয়াজ কমিটি। অন্য দু'জন সদস্য হন এস এন মৈত্র এবং নেতাজীর দাদা সুরেশ চন্দ্র বসু। শাহনওয়াজ কমিটির কাজ শুরু হওয়ার পরই সুরেশবাবুর সঙ্গে শাহনওয়াজ খানের বিরোধিতা শুরু হয়। শাহনওয়াজ খানের বক্তব্য ছিল ১৯৪৫-এ বিমান দুর্ঘটনাতেই নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু সুরেশবাবু বলেছিলেন, কোনও বিমান দুর্ঘটনাই হয়নি। কাজেই নেতাজীর মৃত্যুর প্রশ্নই নেই। তাতে অসন্তুষ্ট হন শাহনওয়াজ খান। তিনি সুরেশবাবুর বক্তব্য নাকচ করে জানিয়ে দেন, সুরেশ বসুর রিপোর্ট শাহনওয়াজ কমিটির মূল রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত হতে দেবেন না। তবে চাইলে তিনি নিজের রিপোর্ট আলাদাভাবে প্রকাশ করতে পারেন।

নেতাজীর ভ্রাতুষ্পুত্রী তথা সুরেশ চন্দ্র বসুর কন্যা শিলা দাসগুপ্ত কলকাতায় শাহনওয়াজ খানের সঙ্গে দেখা হলেই কটাক্ষ করে বলতেন—'মন্ত্রী হওয়ার জন্য নেতাজীকে মেরে দিলেন?' নেতাজীর যেসব সতীর্থ কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন, তাঁরা পুরস্কৃত হয়েছেন কিন্তু যাঁরা শত প্রলোভনেও নেতাজীর আদর্শ থেকে সরে আসেননি। তাঁরা পেয়েছেন লাঞ্ছনা। ইতিহাস তার সাক্ষী।

২০২১ সালে নেতাজীর জন্মদিনটিকে পরাক্রম দিবস হিসেবে পালন করার কথা ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় সরকার। কেননা নেতাজী মানে দেশপ্রেম। নেতাজী মানে পরাক্রম। নেতাজী মানে আবেগ। নেতাজী মানে ভালোবাসা। যে নেতাজী বিশ্বের সমগ্র বাঙ্গালি তথা ভারতবাসীর হৃদয়ে আছেন, সেই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে যোগ্যস্থানে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়ার জন্য বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য।

আত্মত্যাগ ছাড়া যে রাজনীতির লড়াইয়ে চিরস্থায়ী জয় পাওয়া সম্ভব নয়, নেতাজী তা ভারতবাসীকে এবং ভারতের রাজনীতি বেত্তাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে যতদিন না তাঁর সংগ্রাম, চরিত্রশক্তি, নিঃস্বার্থপরতা, মানবিকতা, প্রাণময়তা ও অভিজ্ঞতাকে আমরা মূলধন না করবো ততদিন তাঁর আত্মার শান্তি নেই। □

THE HINDU

India's National Newspaper

President Proclaims National Emergency

"Security of India Threatened by Internal Disturbances"

Preventive Arrests: Press Censorship Imposed

PM Explains Action

Life Normal in Delhi

ভারতীয় সংবিধানের অপব্যাখ্যা এবং অপ্রয়োজনীয় কাটাছেঁড়া বন্ধ হোক

ড.তরুণ মজুমদার

ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার মূলগ্রন্থ হিসেবে ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর গণপরিষদ বিশ্বের দীর্ঘতম লিখিত নথিতে সংকলিত একগুচ্ছ নীতি গ্রহণ করেছিল, যে নীতিমালা, বিগত সাত দশক ধরে ভারতের রাজনৈতিক এবং কিয়দংশে আর্থ-সামাজিক গতিপথ নির্ধারণ করে চলেছে। সংবিধান বর্ণিত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি। স্বাধীনতা লাভের সময় মাত্র ১২ শতাংশ নাগরিক স্বাক্ষর, এমন একটি দেশে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককে ভোটাধিকার দেওয়ার সিদ্ধান্তই ছিল এই সংবিধানের সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী নীতি। সংবিধানের প্রস্তুতি কমিটির চেয়ারম্যান সম্পর্কে রাজনীতিকরা কাঁড়ি কাঁড়ি গালভরা প্রশস্তি উচ্চারণ করেছেন। কিন্তু বি.আর. আম্বেদকরের যে সৃষ্টিশীল বিচারবুদ্ধি ছিল, তার যথাযথ প্রয়োগে দেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের মান যতটা উন্নত হতে পারত, সেই পথে চলার চেষ্টা তাঁরা করেননি, এমনকী পরবর্তী রাজনৈতিক প্রজন্মও সে পথ মাড়ায়নি। উলটে, দশকের পর দশক ধরে সংশোধনের নামে ক্রমাগত কালেক্টিভ অপব্যাখ্যা ঘটে চলেছে যা প্রকারান্তরে পৃথিবীর বৃহত্তম লিখিত সংবিধানকে কলুষিত করছে।

জরুরি অবস্থা চলাকালীন ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে পার্লামেন্ট সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'সেকুলার' ও 'সোশ্যালিস্ট' শব্দ দুটির সংযোজন করা হয়, যদিও সেখানে শব্দদুটির বিন্দুমাত্র ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। সোশ্যালিস্ট কথাটির আক্ষরিক অর্থ ধরলে তা সম্পত্তির ওপর সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় অধিকারকে মান্যতা দেয়। এই ধারণাটি সম্পূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিপরীতে অবস্থান করছে। কারণ ভারতীয়রা কোন্ সমাজব্যবস্থায় স্বেচ্ছায় বসবাস করতে চান তা সংবিধান বদলের মাধ্যমে বলপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া যায় না। অপরদিকে সংবিধানের ২৫তম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নাগরিকদের নিজ নিজ ধর্মাচরণ ও তার প্রচারের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। অথচ ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের প্রস্তাবনায় সেকুলার শব্দটি যোগ করে নাগরিকদের বলপূর্বক সেকুলার বানানোর বিকৃত প্রচেষ্টায় সরকার উদ্যোগী হয়েছে।

সংখ্যালঘুদের ভাষাগত, জাতিগত, বর্ণ ও ধর্মীয় সুরক্ষা দেওয়ার জন্য সংবিধানের ২৯ ও ৩০ অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত মৌলিক অধিকারগুলির বর্ণনা দেওয়া আছে। সংবিধানে এমন কোনো উল্লেখ নেই যে সংখ্যালঘুদের একটি শ্রেণী অন্য শ্রেণীর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং সংবিধান অনুযায়ী সংখ্যালঘুদের চারটি শ্রেণীই সমান মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু ধর্মীয় সংখ্যালঘু ব্যতীত

ভাষাগত বা বর্ণের সংখ্যালঘুরা রাজনীতিতে খুবই কম গুরুত্বপূর্ণ! এটা চরম বিকৃতির একটি নিদর্শন মাত্র। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যেও শুধুমাত্র একটি বিশেষ সম্প্রদায় বরাবর মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। বাস্তবে 'সংখ্যালঘু সুরক্ষা' ধারণাটি খসড়া সংবিধানে ১৯৪৬ সালের শেষের দিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। তখনও ভারত ভাগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। কারণ ১৯৪৭ সালের মার্চ পর্যন্ত দেশের কেউই বিভাজনের দাবিকে গুরুত্ব দেয়নি। সম্ভবত এটা লেখা হয়েছিল মুসলিম লিগকে শান্ত করার জন্য যাতে তারা দেশভাগের দাবি থেকে বিরত থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই ধারা ও অনুচ্ছেদগুলি বহাল থাকে স্বাধীনতার পরেও। অন্যদিকে অনুচ্ছেদ ১৪ স্পষ্টভাবে বলে যে সমস্ত নাগরিকই সমান। একই সংবিধানের বেশ কিছু অনুচ্ছেদ পারস্পরিক সঙ্গতিপূর্ণ না হয়ে যখন তা সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী হয়, তখন তাকে বিকৃতিই বলা চলে। একই সংবিধান কখনো বলছে সকল নাগরিক রাষ্ট্রের কাছে সমান, আবার সেই সংবিধানই কখনোও বলছে কিছু নাগরিক অন্যান্য নাগরিকদের থেকে দ্বিগুণ সুবিধা ভোগ করবে—একে দ্বিচারিতা ছাড়া আর অন্য কোনোভাবেই ব্যাখ্যা করা যায় না। আসলে দশকের পর দশক ধরে অত্যন্ত ধূর্ততার সঙ্গে কায়েমি রাজনৈতিক স্বার্থ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২৫ থেকে ৩০ অনুচ্ছেদের অপব্যাখ্যা হয়ে চলেছে এবং এর সঙ্গে যোগ হয়েছে হিন্দু ভাবাবেগ বিরোধী অনুচ্ছেদ ৩১-এর সহাবস্থান, যা কিনা সংখ্যালঘুবাদ এবং হিন্দুবিরোধী মেকি ধর্মনিরপেক্ষতাকে সমাজে উসকে দেওয়ার অন্যতম হাতিয়ার।

এই পর্বেই কমিটেড জুডিশিয়ারি বা শাসকের প্রতি দায়বদ্ধ বিচার ব্যবস্থা বানানোর জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিল শাসকগোষ্ঠী। অথচ সংবিধানের বিন্যাসেই বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতার দর্শন প্রোথিত আছে। কারণ নাগরিকদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে সাংবিধানিক আদালত হিসেবে হাইকোর্টগুলি এবং সুপ্রিম কোর্ট যথাক্রমে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২২৬ এবং ৩২ অনুযায়ী নাগরিকদের ন্যায় বিচারের জন্য হস্তক্ষেপ করার অধিকারী। অনুচ্ছেদ ১৪১ অনুযায়ী দেশের সর্বোচ্চ আদালতের কোনও রায় দেশের আইন বলেই স্বীকৃত হয়। প্রাতিষ্ঠানিক শাসন ক্ষমতা বড়ো না বিচারব্যবস্থা বড়ো , এই প্রশ্নটাই এই সময় রাজনীতির মাঠে ময়দানে ঘুরপাক খাচ্ছিল।

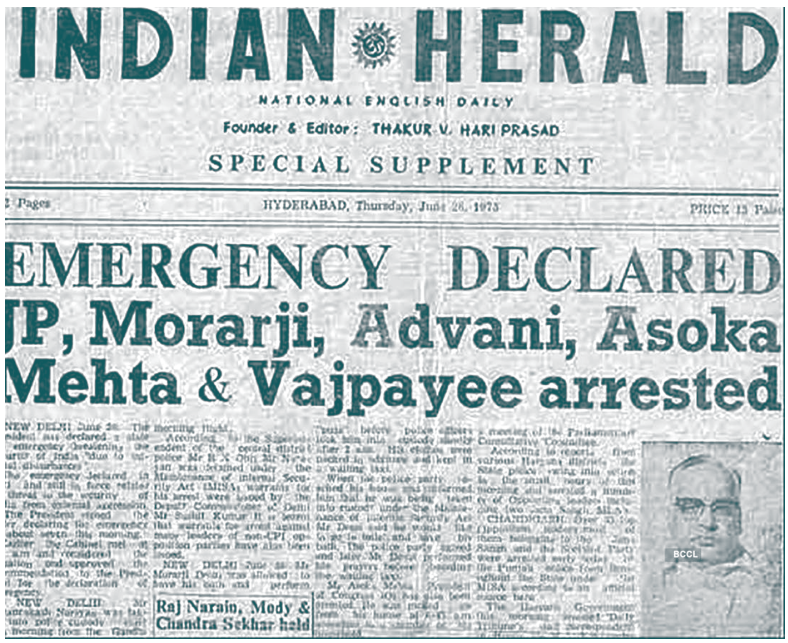

INDIAN HERALD

NATIONAL ENGLISH DAILY

Founder & Editor: THAKUR V. HARI PRASAD

SPECIAL SUPPLEMENT

HYDERABAD, Thursday, June 26, 1975

EMERGENCY DECLARED

JP, Morarji, Advani, Asoka Mehta & Vajpayee arrested

Raj Narain, Mody & Chandra Sekhar held

bharat

Litho

puts life in printing

98/4, S. N. Banerjee Road
Kolkata - 700 014
(India)
Phone : +91 33 22657862, 22493855
Fax : + 91 22651063
bharatlitho@gmail.com
surendradhote@gmail.com,
www.bharatlitho.com

With Best Compliments from-

Sindhuja Indocorp Pvt. Ltd.

5, Clive Row, 2nd Floor
Room No. 56
Kolkata - 700 001

With Best Compliments from-

A WELL WISHER

With Best Wishes-

UMAYA

Dry-Fruits & Spices
Umaya.contact@gmail.com
M.: 9831126557

১৯৭৩-এ বিখ্যাত কেশবানন্দ ভারতী মামলায় সর্বোচ্চ আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানজাত এবং সংবিধানের প্রতি দায়বদ্ধ; শাসকদলের কাছে নয়। এই মামলার রায়ে সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের প্রস্তাবনাকে সংবিধানের অংশ হিসেবে স্বীকার করে নেয় এবং বলে যে পার্লামেন্ট সংবিধানের প্রস্তাবনাকে সংশোধন করতে পারলেও কখনোই তার মৌলিক চরিত্র ও আদর্শে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। যদিও ১৯৭৬ সালে তা মানা হয়নি।

স্বাধীনতার ২৮ বছর পর ২৬ জুন ১৯৭৫ সালে, সকাল ছ'টায় দিল্লির আকাশবাণী ভবন থেকে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জাতির উদ্দেশে ভাষণে বলেন— ''The president has proclaimed emergency. this is nothing to worry about it.''

যা ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে যায় বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের এক অন্ধকারময় অধ্যায়। ভারতের গণতন্ত্র কার্যত পঙ্গু হয়ে যায়। সংবাদমাধ্যমের ওপর সেন্সর চাপানো হয়। সংবাদপত্র অফিসের ইলেক্ট্রিসিটি লাইন কেটে দেওয়া হয়। গ্রেপ্তার করা হয় বিরোধী দলনেতাদের। জোর করে বন্ধ করে দেওয়া হয় সরকার বিরোধী আন্দোলন-জমায়েত। বিশিষ্ট সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার করা হয়। সমস্ত নির্বাচন কর্মসূচি বন্ধ হয়ে যায়। কেড়ে নেওয়া হয় সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার। ১৯৭৫ সালের এই জরুরি অবস্থা ছিল যুদ্ধপরিস্থিতি বহির্ভূত কোনও কারণে প্রথম জরুরি অবস্থা। এর পিছনে কারণ হিসেবে দেখানো হয়, বিরোধীরা অভ্যন্তরীণ শান্তিভঙ্গ করার চেষ্টা করছে। তবে ঐতিহাসিকদের মতে এই জরুরি অবস্থার প্রেক্ষাপট রচনা শুরু হয় ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে। সেই সময় থেকেই তীব্র অর্থসংকটে দেশ জর্জরিত হচ্ছিল। তা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অভিজাত শ্রেণী ও তাদের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি কংগ্রেস দল কোনো গণতান্ত্রিক পথ বেছে নিতে রাজি ছিল না। ইতিমধ্যেই ১৯৬২ ও ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে দেশের মিশ্র অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে। খাদ্যসংকট চরমে পৌঁছয়। শাসকদলের অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে অরাজকতা চরমে পৌঁছায়। রাজ্যে রাজ্যে জনবিচ্ছিন্ন বশংবদ আঞ্চলিক নেতার হাতে ক্ষমতার রাশ আর কেন্দ্রীয়স্তরে তথাকথিত হাইকমান্ডের নামে এক দুষ্টচক্র ক্ষমতাকে করায়ত্ত করে। পরিস্থিতির এই পর্যায়ে স্বৈরাচার তার আগ্রাসী হামলা নামিয়ে দেয়। ১৯৭৫-এর ২৫ জুন মধ্যরাতে রবারস্ট্যাম্প রাষ্ট্রপতি সংবিধানকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে গণতন্ত্র হত্যাকারী কালা-ফতোয়া জারি করেন। অথচ সংবিধানের ৩৫২ ধারায় পরিষ্কার উল্লেখ আছে--- যুদ্ধ, বহিঃশত্রুর আক্রমণ, অভ্যন্তরীণ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মতো পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা যেতে পারে। ১৯৭৫ সালে উপরোক্ত কোনো পরিস্থিতিই সৃষ্টি হয়নি। দীর্ঘ একুশ মাস ধরে চলা এই জরুরি অবস্থার বাড়াবাড়ি এবং স্বৈরাচার নিয়ে তদন্ত করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত শাহ কমিশনের তিনটি রিপোর্টের কোথাও উল্লেখ নেই যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা কবে, কখন, কোন অধিবেশনে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। গণতন্ত্র হত্যার এই লগ্নে বামেদের একটি বৃহত্তম অংশ স্বৈরাচারকে নির্লজ্জভাবে সমর্থন করে গেছে।

১৯৭১ সালে ইন্দিরা গান্ধী রায়বেরেলি কেন্দ্র থেকে এক লক্ষেরও বেশি ভোটে দ্বিতীয়বারের জন্য জয়লাভ করেন, তখন তাঁর বিপরীতে দাঁড়ানো ইউনাইটেড সোসালিস্ট পার্টির নেতা রাজনারায়ণ সিংহ এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওই কেন্দ্রের নির্বাচনে ছ'টি দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন। এই অভিযোগগুলির মধ্যে ছিল সরকারি সেক্রেটারিকে নির্বাচনের কাজে ব্যবহার করা, অতিরিক্ত টাকা খরচ করা, বায়ুসেনার হেলিকপ্টার ব্যবহার করা ইত্যাদি। বিচারপতি জগমোহনলাল সিংহের এজলাসে বিচারকার্য চলতে থাকে। এরই মধ্যে ইন্দিরা গান্ধী সরকারের সংসদে দুটি বিল পাশ করানোকে নিয়ে বিরোধ বাঁধে সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে। চোদ্দটি বেসরকারি ব্যাংকের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ এবং স্বাধীনতার আগের রাজা ও তাঁদের পরিবারবর্গের সরকারি পেনশন বন্ধ করা —এই দুটি বিল পাশ করাতে না পারার কারণ হিসেবে শ্রীমতী গান্ধী সুপ্রিম কোর্টকেই দায়ী মনে করতেন। তাই সুপ্রিম কোর্ট যাতে ভবিষ্যতে আর কখনোও সংসদের কাজে হস্তক্ষেপ করতে না পারে সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সংবিধানকে কাটাছেঁড়া করতে শুরু করে ইন্দিরা সরকার। ৫ নভেম্বর

SANHIT POLYMER

Sriniketan Road, Bolpur, Birbhum, West Bengal - 731204

Phone : +91+3463-255-560 / 257-769, E-mail : sanhitpolymer@yahoo.co.in
Fax :+91-3463-254215

Factory : Shibtala-Surul Road, Bolpur, Dist. : Birbhum, West Bangal 731204, Phone : +91+3463-234517 / 645017 / 09732024706

APPLICATION

Industry & Packaging

PP - Icecream cup & Cotainer
HDPE LLDPE Tarpaulim
Pond Liner
Pole (Concrite)
Green House
Geomembrane
LDPE Film/Sheet
'CORAL' Water Tank

Civil & Construction:

Construction Film for concrete
Separation membrane for Road Construction
Liner for Hazards West Pond
Liner for Water Reservoir
Disposal Glass & Cup

With Best Compliments From :-

MUKHERJEE ENGINEERING CO.

Manufacturer of

R. C. C. SPUN PIPES, COLLARS & ALLIED ITEMS

Head Office & Workshop

Sriniketan Road, Bolpur, Pin - 731 204

Phone : (03463) 254-215 (O), Mobile : 9434009737, 919434762433
E-mail : mukherjeeengineeringco@yahoo.com Fax : 03463-254215

১৯৭১, সংবিধানের ২৪তম সংশোধন এবং পরের বছর এপ্রিল মাসে ২৫ তম সংশোধন। যার দ্বারা সরকার চাইলে সংসদে যেকোনো ধরনের বিল পাশ করাতে পারে তাতে যদি সংবিধানের মূল ভাবনাকেও পরিবর্তন করতে হয় তো কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু এবারও বাধ সাধলো সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এস এম সিক্রির নেতৃত্বে ১৩ জন বিচারপতির বেঞ্চ গঠিত হলো, যা ভারতের ইতিহাসে প্রথম ও শেষবারে মতো এত বড়ো বিচার বিভাগীয় বেঞ্চ। ৭-৬ ভোটে ওই বেঞ্চ বিলগুলিকে খারিজ করে দেয়। একদিকে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং অন্যদিকে দেশের রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর কথামতো চললেও তাঁর পথে একমাত্র প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে যাচ্ছিল সুপ্রিম কোর্ট।। তাই সেখানেও চাই একটা 'কমিটেড জুডিশিয়ারি' অর্থাৎ এমন একজন চাকুরিজীবীকে চাই যে সরকারের কথামতো চলতে পারে, সরকারের কোনোরকম কাজে বাধা সৃষ্টি করবে না। আর ঘটনাক্রমে এই রায় ঘোষণার ঠিক একদিন পরই প্রধান বিচারপতি সিক্রির অবসরের দিন চলে আসে। পরম্পরা অনুযায়ী তাঁর পরে সবচেয়ে সিনিয়র বিচারপতিরই ওই আসনে বসার কথা ছিল, কিন্তু তা হলো না। সিক্রির পর পদমর্যাদা অনুযায়ী তিনজন বিচারপতিকে বাদ দিয়ে প্রধান বিচারপতির স্থানে আনা হলো এ এন রায়কে। আর তিনি আসামাত্রই যে যে বিল সুপ্রিম কোর্ট অন-হোল্ড করে রেখেছিল, সেগুলোকে সংসদে পেশ করার ছাড় পত্র দিয়ে দিলেন। এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই সেগুলো পাশও হয়ে গেল। আর এখানেই শুরু হলো বিরোধী দলনেতা তথা স্বাধীনতা সংগ্রামী জয়প্রকাশ নারায়ণের সঙ্গে বিরোধিতা, যা জরুরি অবস্থাকে ত্বরান্বিত করেছিল।

১২ জুন ১৯৭৫, এলাহাবাদ হাইকোর্টে নির্বাচনী মামলা প্রধানমন্ত্রীর বিপক্ষে গেল। ঘোষণা হলো যে আগামী ছয় বছরের জন্য প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে লড়তে পারবেন না এবং সঙ্গে রায়বেরিলি কেন্দ্র থেকে তাঁর জয় বেআইনি ঘোষণা করে দেওয়া হলো। কিন্তু এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী ইস্তফা না দেওয়ায় জয়প্রকাশ নারায়ণ দিল্লির রামলীলা ময়দানে এক জনসভার ডাক দেন। জুন মাসের তীব্র দাবদাহে সেদিনের জনসভায় উপস্থিত ছিলেন প্রায় ৫ লক্ষ মানুষ। রামলীলা ময়দানে পাঁচ লক্ষ মানুষের ভিড় দেখে ভীত প্রধানমন্ত্রী আর চুপচাপ বসে থাকতে পারেননি। তৎকালীন কংগ্রেস অধ্যক্ষ দেবকান্ত বড়ুয়াকে নিয়ে সেদিন সন্ধ্যাতেই পৌঁছে যান রাইসিনা হিলসে। রাষ্ট্রপতি ফখরুদ্দিন আলি আহমেদকে ক্যাবিনেটের অজান্তেই অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা জারি করার অনুরোধ করা হয়। রাত সাড়ে ১১ টা নাগাদ রাষ্ট্রপতি ভবনে জরুরি অবস্থার প্রস্তাবের খসড়া গিয়ে পৌঁছায়। সেখানে স্বাক্ষর করেন ফখরুদ্দিন আলি আহমেদ। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই দেশের সমস্ত ক্ষমতা অনির্দিষ্টকালের জন্য অলিখিতভাবে চলে যায় প্রধানমন্ত্রীর হাতে। লোকসভা বা বিধানসভার সমস্ত নির্বাচন স্থগিত করা হলো। বিরোধী দল বলে আর কিছুই রইল না। সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার অর্থাৎ সংবিধানের ২১ নম্বর ধারা অকার্যকর করে রাখা হলো। মাঝরাতে গ্রেপ্তার হলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ, অটলবিহারী বাজপেয়ী, মোরারজী দেশাই, চৌধুরী চরণ সিং, আচার্য কৃপালানী, লালকৃষ্ণ আদবানী-সহ প্রমুখ বিরোধী নেতা। আজকাল আন্দোলনের নাম করে কথায় কথায় সংবিধানের কপি হাতে নিয়ে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখায় বামেদের একটি বৃহত্তর অংশ কিন্তু সেদিন বামপন্থীরা নির্লজ্জভাবে গণতন্ত্র ধ্বংসের এই পৈশাচিক কার্যক্রমে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল।

এমন পরিস্থিতিতে একমাত্র সুপ্রিম কোর্টই পারে জরুরি অবস্থার প্রয়োজনীয়তা বিচার করে সংবিধান রক্ষা করতে আর ঠিক সেই আশঙ্কার কথা মাথায় রেখেই ইন্দিরা গান্ধী সংসদে পাশ করালেন দুটি সংবিধান সংশোধনী, ৩৮ ও ৩৯। প্রথমটির দ্বারা সুপ্রিম কোর্টের জরুরি অবস্থার প্রয়োজনীয়তা বিচারের অধিকার কেড়ে নেওয়া হলো আর দ্বিতীয়টির দ্বারা কেড়ে নেওয়া হলো প্রধানমন্ত্রীর কোনও কাজের ওপর কোর্টের হস্তক্ষেপ করার অধিকার। শাসনতান্ত্রিক স্বৈরাচার চরম মাত্রায় পৌঁছালো।

বহুলচর্চিত ৩৭০ ধারা সংবিধানের একবিংশ অংশের প্রথম অনুচ্ছেদেই ছিল। এই অংশের শিরোনামটি ছিল—সাময়িক, পরিবর্তন সাপেক্ষ এবং বিশেষ বিধান। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে সযত্নে চালিত প্রোপাগান্ডার ফলে আমরা ভুলতেই বসেছিলাম যে এই বিধানটি ছিল সাময়িক। আবার ১৯৫৪ সালে রাষ্ট্রপতির নির্দেশের মাধ্যমে একতরফাভাবে ৩৫-এ ধারাকে সাংবিধানিক মর্যাদা দেওয়ার মাধ্যমে জম্মু-কাশ্মীরের বাসিন্দাদের মানসিকভাবে ভারতভূমির অন্যান্য অংশের বাসিন্দাদের থেকে চিরকাল আলাদা করে রেখে কায়েমি রাজনৈতিক স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। ভূস্বর্গের সার্বিক উন্নতি এবং 'মানসিক-ভারতভুক্তির' এই অপধারা দুটিকে রদ করা হলে শ্রেণী স্বার্থে পরিচালিত সমাজের একটি অংশের মধ্যে অসন্তোষ খুব স্বাভাবিকভাবেই বাড়তে দেখা যায়।

১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি যে সংবিধানের পথ চলা শুরু হয়েছিল মাত্র ৭০ বছরে তা ১০৪ বারেরও বেশি সংশোধন করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানই সম্ভবত বিশ্বে সবচাইতে বেশিবার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি দিয়ে পর্যালোচনা করলে অনুধাবন করা যায় যে অনেক ক্ষেত্রেই কায়েমি স্বার্থে পরিচালিত হয়ে সংবিধানের কাটাছেঁড়া করা হয়েছে। তাছাড়া ভারতীয় সংবিধানে অনেকগুলি পরস্পর বিরোধী অনুচ্ছেদের সহাবস্থান এটিকে বেশরভাগ ক্ষেত্রে পক্ষপাতদুষ্ট এবং flawed করে তুলেছে। তাই ভবিষ্যৎ বংশীয়দের হাতে সুন্দর পক্ষপাতবিহীন বাসযোগ্য সমাজ তুলে দিতে হলে এখন থেকেই রাষ্ট্রহিত বোধে জারিত প্রত্যেক মানুষকেই সোচ্চার হতে হবে যাতে অনাবশ্যক ভারতীয় সংবিধানের কাটাছেঁড়া বন্ধ করা যায় এবং আবশ্যিকভাবে অনতিবিলম্বে সংবিধানের দোষ-ত্রুটিগুলিকে চিহ্নিত করে তার যথোপযুক্ত বিহিত করা যায়।

(লেখক বিশিষ্ট অধ্যাপক ও গবেষক)

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :-

ASHOKA TOOLS PVT. LTD.

MECHANICAL & STRUCTURAL ENGINEERS

email : ashokatools@hotmail.com

-: REGD. OFFICE :-

23A, Netaji Subhas Road,

11 th Floor, Room No. 31,

Kolkata-700 001

Phone No. 9331229004

-: FACTORY :-

Santra para, Par Dankuni

Hooghly, Pin- 712310

PHONE : OFFICE : 2231-9166/

PH. 9903853534

With the best Compliments from :

JALAN CHEMICAL & INDUSTRIES PVT. LTD.

Director : Rajesh Jain

27AB Royd Street, Ground Floor

Kolkata-700016

Phone : 22297263

ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মবাণী ভারতের সংবিধান

অজয় সরকার

Constituent Assembly-এর মোট ২৯৯ জন সদস্যের মধ্যে ২৮৪ জন সদস্যের উপস্থিতিতে এবং তাদের স্বাক্ষর করা সম্মতিতে ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর জানুয়ারি থেকে লাগু হয়। তবে সংবিধানের প্রধান প্রধান অংশসমূহ ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে লাগু হওয়ার জন্য ২৬ জানুয়ারিকে ভারতের সাধারণতন্ত্র দিবস হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে।

সংবিধানের চূড়ান্ত খসড়া গৃহীত হওয়ার পর, লিখিত সংবিধানের চেহারা কেমন হবে, তা নিয়ে সংবিধান প্রণেতাদের মধ্যে বেশ শলাপরামর্শ চলে। সংবিধান প্রণেতারা সবাই একমত হন যে সংবিধানের প্রতিটি অধ্যায়ের সূচনা হবে ভারতীয় জীবন সংস্কৃতির পরিচয় জ্ঞাপক এক আলেখ্য দিয়ে। প্রতিটি ভারতীয় যেন এই পবিত্র সংবিধানে খুঁজে পায় তার মহান এবং পূর্বপুরুষদের গৌরবগাথা ও মহান পরম্পরাকে। এই মহান কাজে দেশের বরেণ্য শিল্পীদের ডাক পড়লো এবং তারা সানন্দে গুরদায়িত্ব কাঁধে নিয়ে কাজে লেগে পড়লেন। সংবিধানের মূল সংস্করণকে নিপুণ শিল্পকলার সৌন্দর্যে ভরিয়ে দেওয়ার গুরু দায়িত্ব অর্পণ করা হলো শান্তিনিকেতনের জগদ্‌বন্দিত শিল্পী নন্দলাল বসুর উপর। হাতে লেখা সংবিধানের একটি অধ্যায় শেষ হওয়ার পরে এবং পরবর্তী অধ্যায় শুরু হওয়ার আগে অতীত ভারতের বিভিন্ন চিত্র, ঋষিমুনিদের ছবি, অনেক পৌরাণিক চরিত্রের সুনিপুণভাবে অঙ্কন করা হলো। এর মাধ্যমে শিল্পীরা আমাদের ঐতিহ্য ও পরম্পরা স্মরণ করিয়ে দিতে চাইলেন যা সংবিধান প্রণেতারা লেখনীতে প্রকাশ করতে পারেননি। তাদের সঙ্গতভাবেই মনে হয়েছিল যে শিল্পকলা শব্দের চেয়ে অনেক বেশি বাঙ্ময়। তারা বিচক্ষণ পণ্ডিত, ভুল করেননি।

সংবিধানের তৃতীয় শিডিউলের বিষয়বস্তু হলো সরকার কর্তৃক নাগরিকদের প্রদত্ত মৌলিক অধিকারসমূহ। ভারতের সংবিধানে এই অংশটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এই অংশ সরকারের স্বেচ্ছাচারিতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নাগরিকদের রক্ষাকবচের কাজ করে। সংবিধানের এই অংশটি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণেই এই অধ্যায়ের সূচনা পর্বে সংবিধান প্রণেতাদের সম্মতিক্রমে শিল্পীরা শ্রীরাম, সীতা ও লক্ষ্মণের ছবিকে স্থান দিয়েছেন। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে দীর্ঘ ৮০০ বছর ধরে ভারতীবাসী ছিল প্রকৃতঅর্থে পরাধীন। শাসনের নামে ভারতীয়দের যেমন অবর্ণনীয় ভাবে বর্বরতায় নিষ্পেষিত হতে হয়েছে, ঠিক তেমনি তার নিজস্ব কৃষ্টি সংস্কৃতিকে ধূর্ততার সঙ্গে ভুলিয়ে দেওয়ার অনবরত চেষ্টা হয়েছে। সংবিধান প্রণেতারা এই নির্মম সত্যকে সঠিকভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন।

তাই তারা সংবিধানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশের প্রারম্ভে শ্রীরাম, সীতা ও লক্ষ্মণের চিত্র এঁকে যেন বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়া ভারতীয় সমাজকে তার প্রাচীন গৌরবগাথাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন। গৌরবগাথা কী? এক কথায়, উত্তর হলো রামরাজ্য। রামরাজ্য বলতে আমরা এক আদর্শ শাসন ব্যবস্থাকে বুঝি। সংবিধান প্রণেতারা তাদের সংবিধানের মধ্য দিয়ে এক আদর্শ শাসন ব্যবস্থা আমাদের উপহার দিতে চেয়েছিলেন।

ভারতের সংবিধানের ১৪তম ধারায় সমানাধিকারের কথা বলা আছে। এই ধারার বক্তব্য কথা হলো, 'Equality before law and Equal Protection of Laws'। নিসন্দেহে নাগরিক অধিকার রক্ষায় এই সাংবিধানিক রক্ষাকবচ আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এক কথায়, ভারতীয় সংবিধানের ১৪তম ধারাটি হলো মৌলিক অধিকারসমূহের মর্মবাণী। সংবিধানের তৃতীয় পরিচ্ছদের প্রারম্ভে শ্রীরামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণের চিত্রের উপস্থিতির মধ্যে এক আদর্শ শাসন ব্যবস্থার (রামরাজ্যের) প্রতীকায়িত রূপ আমাদের সামনে উপস্থাপনা করা হলো। স্বাভাবিকভাবেই একটা কৌতূহল জাগে যে রামরাজ্যে প্রজাস্বার্থে এই মৌলিক অধিকার সমূহ কীভাবে রক্ষিত হতো?

রামায়ণে আমরা নিষাধরাজের উল্লেখ পাই। নিষাধরাজ ছিলেন জাতিতে শূদ্র, জঙ্গলে বসবাসকারী বনবাসীদের রাজা। অথচ, ক্ষত্রিয়বীর শ্রীরামচন্দ্রের রাজকীয় কৌলিন্য নিষাধরাজকে আলিঙ্গনাবদ্ধ হতে কোনো বাধা হয়নি। অপরাপর ক্ষত্রিয় রাজাদের যে সম্মান ও মর্যাদা শ্রীরামচন্দ্র দিয়েছেন, নিষাধরাজের ক্ষেত্রে তার সামান্যতম ব্যতয় হয়নি। মাতা শবরী এক অতি সাধারণ মহিলা যিনি বনবাসী শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। গান্ধীর ভাষায় অস্পৃশ্য হরিজন। আমাদের মধ্যে যারা রাজনীতি করেন, তাদের কাছে শবরী হলেন 'ভোট ক্যাচার'। কিন্তু শবরীর মতো অতি নগণ্য মহিলার পদস্পর্শ করতে মহাপরাক্রমশালী অযোধ্যাপতির কোনো অসুবিধা হয়নি। মৃত্যুতেও সমানাধিকারের আদর্শ থেকে শ্রীরামচন্দ্র বিচ্যুত হননি। লঙ্কাপতি রাবণ বা রাক্ষসী তাড়কা শ্রীরামচন্দ্রের কাছে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত হয়। অথচ শ্রীরামচন্দ্র পরিপূর্ণ মর্যাদায় তাদের দেহের পার্থিব সৎকার করেন। শুধু কি রাবণ বা তাড়কার দেহ সৎকার? প্রতিটি শত্রুসেনার অন্তেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করার সময় শ্রীরামচন্দ্র সশরীরে উপস্থিত থেকেছেন। কারগিলের যুদ্ধে নিহত ক্যাপ্টেন সৌরভ কালিয়ার নশ্বর দেহ তার পরিবার ফিরে পেয়েছিল বটে, কিন্তু তার দেহের এমন কোনো অংশ ছিল না যেখানে পাকিস্তানিরা বর্বরতার চিহ্ন এঁকে দেয়নি।

অপরপক্ষে, যেসব পাকিস্তানি সেনা যুদ্ধে নিহত হয়েছিল, তাদের জন্য ইমাম ডেকে যথাযোগ্য মর্যাদায় তাদের অন্তেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছিল। আমাদের সেনাদের মধ্যে এই উন্নত মানবিকতাবোধের এবং মূল্যবোধের উৎস কী? উত্তর হলো ভারতীয় জীবনের সংস্কার যা এই দেশের মানুষ মর্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের কর্মজীবন থেকে আহরণ করেছে। এটাই ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মবাণী। যার প্রতিফলিত হয়েছে আমাদের সংবিধানে। □

ACC LOGISTICS

Fleet Owners & Transport Contractors

Registered Government Contractor

40, Girish Park (North),

1st Floor, Suit # 01

Kolkata - 700 006
(Near Calcutta Medicos)

Phone : +91 33 40726528, 40036528 E-mail : ashok@acclogistics.in

URL : www.acclogistics.in

An ISO 9001:2008 Company

সুভাষচন্দ্রের নেতাজী হয়ে ওঠার নেপথ্যে শিক্ষক বেণীমাধব দাস

দিগন্ত চক্রবর্তী

একটি গাছ বড়ো বৃক্ষে পরিণত হলে আমরা তাকে চিনতে পারি। কিন্তু তার বীজ বপন কে করল তার খবর আমরা রাখি না। ঠিক সেই রকমই ভারতবাসী তথা সমগ্র বিশ্ববাসী সুভাষচন্দ্র বসুকে চিনেছে নেতাজী হিসেবে। কিন্তু তাঁর নেতাজী হয়ে ওঠার দেশপ্রেমের বীজ যিনি বপন করেছিলেন তিনি আর কেউ নন তারই প্রিয় শিক্ষক বেণীমাধব দাস।

সুভাষচন্দ্র ছোটো থেকেই স্বপ্ন দেখতেন তার মামার মতো বড়ো পদে চাকরি করার। কারণ তাঁর মামা বিনোদ চন্দ্র মিত্র ছিলেন বাঙ্গলার আটর্নি জেনারেল। তখন বাঙ্গালি এলিট সমাজে ইংরেজ সরকারের অধীনে উচ্চপদস্থ চাকরিকেই মর্যাদার কাজ হিসেবে ধরা হতো। তাই ছোটো থেকেই তিনি ভাবতেন হয় মামার মতো বড়োপদে চাকরি করবেন, না হলে আইসিএস হবেন। কিন্তু কটক রাভেন'শ কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাস সুভাষের চিন্তাভাবনাকে সম্পূর্ণভাবে পালটে দিলেন। স্কুলের প্রথম দিন যখন বেণীমাধববাবু বারান্দায় হেঁটে যাচ্ছিলেন তখন তাকে দেখে কোর্ট-প্যান্ট পরিহিত ইংরেজ কর্মচারীদের প্রতি এতদিন সুভাষচন্দ্রের যে অন্ধভক্তি ছিল তা এক ঝটকায় ক্ষীণ হয়ে যায়। বরং ধুতি পাঞ্জাবি পরিহিত ব্যক্তিত্বপূর্ণ মানুষটি হয়ে উঠলেন তার জীবনের আদর্শ। সুভাষচন্দ্র যে খুবই মেধাবী ছাত্র বেণীমাধববাবু তা প্রথম দিন থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন। প্রধান শিক্ষকের সেই ধারণা যে সঠিক ছিল তার প্রমাণও সুভাষ দিতে থাকলেন প্রতিবছর ক্লাসে প্রথম হয়ে।

সুভাষচন্দ্র যখনই এই প্রিয় শিক্ষকের ক্লাস করার সুযোগ পেতেন মুগ্ধ হয়ে শুনতেন তাঁর

কথা। বেণীমাধববাবু উপদেশ দিতেন মানুষের মতো মানুষ হওয়ার জন্য। শোনাতেন নেপোলিয়ানের বীরত্বের কথা। তিনি সুভাষকে বোঝালেন, সংসারে প্রকৃত সিদ্ধি লাভের জন্য প্রয়োজন মনের উন্নতি ও চারিত্রিক বল। যার মধ্যে চারিত্রিক বল নেই সেই পৃথিবীতে মূল্যহীন।

প্রধান শিক্ষকের এই উপদেশ তাঁকে উদাসীন করে তুলত। তাই তাঁর বাবার গাড়ি, বাড়ি, আর্থিক স্বচ্ছলতা কোনো কিছুতেই তার আগ্রহ ছিল না। চরিত্র গঠনের পাশাপাশি বেণীমাধববাবু সুভাষকে শিখিয়েছিলেন বিশ্ব প্রকৃতিকে ভালোবাসতে। লোভ-লালসা, মোহ সংকীর্ণতা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে। প্রধান শিক্ষকের এই কথাগুলি কিশোর সুভাষের মনে গভীর ভাবে প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল। বিশ্ব প্রকৃতির প্রতি তার ভালোবাসা জন্মেছিল। তাই প্রায়ই কিশোর সুভাষ চলে যেতেন নদীর তীরে নির্জন কোনও স্থানে ধ্যান অভ্যাস করার জন্য।

১৯০৯ সালের ১১ আগস্ট বীর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসি হওয়ার পর থেকে গ্রামে গঞ্জে বিভিন্ন স্থানে ১১ আগস্ট ক্ষুদিরাম বসুর আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করা হতো। ১৯১১ সালে সুভাষ ঠিক করলেন যে এ বছর ১১ আগস্ট স্কুলের মধ্যেই স্মরণ করা হবে ক্ষুদিরামকে। প্রধান শিক্ষক বেণীমাধবের ছিল তাতে প্রচ্ছন্ন সমর্থন। ওইদিন কলেজের হস্টেলে উনুন জ্বলল না। ছাত্ররা উপবাস করে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ক্ষুদিরামকে স্মরণ করলো।

এদিকে কলেজ এরিয়া অধ্যাপক সেটা কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিল। কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে গেল, এ যে রাজশক্তির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ। শুরু হলো তদন্ত। কর্তৃপক্ষ বেণীমাধববাবুকে কটক থেকে বদলি করে দিলেন কৃষ্ণনগরে। তাঁর বিদায়ের দিনে সুভাষ আর চোখের জল ধরে রাখতে পারলেন না। বেণীমাধববাবু কোনোরকমে নিজেকে সামলে সুভাষের মাথায় হাত রেখে সস্নেহে বললেন, 'আবার আমাদের দেখা হবে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তুমি যেন একজন মানুষের মতো মানুষ হয়ে উঠতে পারো।'

প্রিয় শিক্ষক চলে গেলেন অনেক দূরে। কিন্তু চিঠিপত্রের মাধ্যমে দুজনের সম্পর্ক আরও নিবিড় হতে থাকলো। সুভাষ তাঁর প্রিয় শিক্ষককে মনের সমস্ত কথা জানাতেন। আর বেণীমাধববাবুও নতুন নতুন চিন্তাভাবনার জোগান দিতে লাগলেন সুভাষের মনে।

দেশ ত্যাগের সময় প্রিয় শিক্ষকের আশীর্বাদ চেয়েছিলেন সুভাষ। স্বামী বিবেকানন্দ ছাড়া যে ব্যক্তির প্রভাব সুভাষের জীবনের সবচেয়ে বেশি, তিনি হলেন তার এই প্রিয় শিক্ষক বেণীমাধব দাস। সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের অনেক পরে ১৯৫২ সালে স্বাধীন ভারতে বেণীমাধব দাসের মৃত্যু হয়। সুভাষচন্দ্র বসুর নেতাজী হয়ে ওঠার নেপথ্যে ছিলেন তাঁরই প্রিয় শিক্ষক এই বেণীমাধববাবু। ■

সুভাষচন্দ্র ও হিন্দুত্ব

রাজদীপ মিশ্র

দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের জন্য আত্মোৎসর্গের সংকল্প করেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁর জীবনের বহু ঘটনা ও লেখনীর মাধ্যমে নিজধর্মের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা প্রকট হয়।

নিজের দেশ সম্বন্ধে খুব গর্ববোধ ছিল সুভাষের মনে। ভারতমায়ের পদতলে নিজেকে সমর্পণের জন্য ধীরে ধীরে প্রস্তুত হচ্ছিলেন তিনি। ১৯১২-১৩ সালে মা-কে এক চিঠিতে তিনি লিখছেন— 'ভারতবর্ষ ভগবানের বড়ো আদরের স্থান— এই মহাদেশে লোকশিক্ষার নিমিত্ত ভগবান যুগে যুগে অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পাপক্লিষ্ট ধরণীকে পবিত্র করিয়াছেন এবং প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে ধর্মের ও সত্যের বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন। ভগবান মানবদেহ ধারণ করিয়া নিজের অংশাবতার রূপে অনেক দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু এতবার তিনি কোনোদেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাই বলি আমাদের জন্মভূমি ভারতমাতা ভগবানের বড়ো আদরের দেশ।'

কিন্তু সমসাময়িক ভারতের দুর্দশার চিত্র অবলোকন করে তিনি আবার মা-কে প্রশ্ন করছেন— '...কিন্তু হায়! যখন ভাবি সেই পুণ্যশ্লোক ঋষিকুল কোথায়? তাঁহাদের সেই পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ কোথায়? তাঁহাদের সেই যাগযজ্ঞ, পূজা, হোম প্রভৃতি কোথায়? —ভাবিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়' (পত্রাবলী— পৃষ্ঠা-১৫-১৮)। খুব অল্প বয়স থেকেই সুভাষের মনের মধ্যে ভগবৎপ্রেম, হিন্দুধর্মের অবতারতত্ত্ব, অবতারের কাজ, ভারতবর্ষের ঋষি, মন্ত্র, যাজ্ঞযজ্ঞ, পূজা প্রভৃতির প্রতি ছিল গভীর নিষ্ঠা।

স্কুলজীবন যতই শেষ হয়ে আসতে লাগল, সুভাষের আধ্যাত্মিক স্পৃহাও ততই তীব্র হয়ে উঠল। এই অবস্থায় স্বামী বিবেকানন্দের বাণী তাঁর সহায়ক হলো। স্বামীজী যে ধর্মের কথা প্রচার করেছিলেন তার ভিত্তি ছিল বেদান্ত দর্শনের যৌক্তিক প্রণালী ও বিজ্ঞানসম্মত পন্থা। তিনি নিজে বলেছেন, 'আমার স্কুলজীবন যতই শেষ হলে আসতে লাগল, ততই গভীরভাবে বাড়তে লাগল ধর্মীয় আবেগ। পড়াশোনার গুরুত্ব আমার কাছে মুখ্য ছিল না।...রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের অনুগামী দুই একজন ছাড়া সাধারণভাবে আর কোনও শিক্ষক আমাদের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার করতে পারেননি' (সমগ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৪)।

প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় তাঁর দৃষ্টি ছিল দুটি দিকে। প্রথমত, যত বেশি সম্ভব সাধুসন্ন্যাসীর সংসর্গ লাভ করা এবং দ্বিতীয়ত, নিজেকে সমাজসেবার জন্য উপযুক্ত করে তোলা। সাধুসঙ্গ লাভের জন্য বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোতে যাতায়াত করতেন। আর্ত ও দরিদ্রনারায়ণের সেবায় নিজেকে নিয়োগ করেছিলেন সুভাষ।

এক সময় গুরুলাভের ইচ্ছা তাঁর এত প্রবল হয়ে ওঠে যে, ১৯১৪ সালে গ্রীষ্মের ছুটিতে তিনি একটি বন্ধুর সঙ্গে গোপনে তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়েন। এই ভ্রমণে তিনি বহু ধার্মিক লোকের সংস্পর্শে এসেছিলেন।

কাশীতে রামকৃষ্ণ মিশনের মঠে গেলে স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁকে স্বাগত জানান। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁর পরিবারের সবাইকে ভালোভাবে জানতেন। সন্ন্যাসজীবন নয়, অন্তরে বৈরাগী থেকে দেশের কাজে তাঁকে আত্মোৎসর্গ করতে হবে— এই ছিল সুভাষের প্রতি স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপদেশ। স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ বলেন : 'প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী নির্বাণানন্দের মুখে শুনেছি স্বামী ব্রহ্মানন্দ সুভাষকে বলেছিলেন যে সন্ন্যাস তাঁর গোত্র নয়, তাঁর জীবন ব্যয়িত হবে অনলস দেশসেবায়। দেশসেবার ক্ষেত্রে তাঁকে ভবিষ্যতে এক বিরাট এবং চিহ্নিত ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে, সেকথাও তিনি

বলেছিলেন' (স্মৃতিচারণ)।

জেলের মধ্যে দুর্গাপূজা, সরস্বতীপূজা, দোলপূর্ণিমা ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করার জন্য সুভাষচন্দ্র সংগ্রাম করেছিলেন। মান্দালয় জেল সুপারের মাধ্যমে বর্মার ইংরেজ চিফ্ সেক্রেটারির উদ্দেশ্যে ১৯২৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি সুভাষচন্দ্র এক চিঠিতে লেখেন : 'আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের সামান্য কয়েকজন খ্রিস্টান অপরাধীর ধর্মানুষ্ঠান পালনের জন্য বছরে ১২০০ টাকা দেওয়া হয় কিন্তু উচ্চশিক্ষিত, সংস্কৃতিবান হিন্দু রাজবন্দিদের ধর্মানুষ্ঠান পালনের জন্য একটা পয়সাও দেওয়া হয় না। মহাশয়, এর ফলে কি সুবিচার এবং সদাচারকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানো হচ্ছে না? একজন ইউরোপীয় খ্রিস্টানের কাছে হিন্দুমাত্রই হিদেন হতে পারে এবং তার ধর্ম কুসংস্কারের বেশি মর্যাদা পায় না, তাকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সুযোগ সুবিধা দেওয়া সেক্ষেত্রে হয়তো নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। কিন্তু আমাদের ধর্ম শুধুমাত্র পরধর্মসহিষ্ণুই নয়, প্রতিটি ধর্মকেই মর্যাদার আসন দেয় এবং বিশ্বাস করে কোনো সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ করার অর্থই হলো ঈশ্বরের বিধানকে অস্বীকার করা' (সমগ্র রচনাবলী— আনন্দ পাবলিশার্স, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৮৯-৯১)।

সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে জেলের সমস্ত বন্দি বসে পড়ল অনশনে। 'পুজো করতে না দিলে না খেয়ে শুকিয়ে মরব। আমাদের মৃত্যুর জন্য দায়ী থাকবে ইংরেজ সরকার।' পনেরো দিন পরে জেল কর্তৃপক্ষ নরম হলো। মেনে নিল বন্দিদের দাবি। বন্দিরা জেলের মধ্যে দুর্গাপুজো করল। মান্দালয় জেলের ইতিহাসে সুভাষচন্দ্র এক নজির সৃষ্টি করলেন। মাতৃসমা বাসন্তীদেবীকে এক চিঠিতে লিখলেন : 'মা, আজ মহাষ্টমী। আজ বাঙ্গলার ঘরে ঘরে মা এসে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। সৌভাগ্যক্রমে আজ কারাগারের মধ্যেও তিনি এসে দেখা দিলেন। আমরা এবছর মান্দালয় জেলে থেকে শ্রীশ্রী দুর্গামাতার পূজা করছি। জেলখানার অন্ধকারের মধ্যে, নির্জীবতার মধ্যে পূজার আলো, পূজার আনন্দ।'

সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষকে হিন্দুস্থান বলেই মনে করতেন। তাই তাঁর ধ্বনি ছিল 'জয় হিন্দ'। হিন্দু ধর্মের প্রতি গভীর ভালোবাসা থেকেই তিনি হিন্দুধর্মের বিস্তারে আগ্রহী ছিলেন। একস্থানে তিনি লিখছেন--- 'আফ্রিকা মহাদেশে এখন মাত্র দুইটি ধর্ম প্রচারিত হইতেছে— খ্রিস্টীয় ও ইসলামীয়। সেখানে হিন্দুধর্ম প্রচারিত হইবে না কেন? ভগিনী নিবেদিতা বলিতেন যে হিন্দু ধর্মকে aggressive হইতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দও এই ভাব প্রচার করিতেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি আমেরিকা ও ইউরোপে গিয়া ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন। ইউরোপে অথবা আমেরিকায় ধর্মপ্রচার করিলে হিন্দুজাতির সম্বন্ধে তাহাদের ধারণার পরিবর্তন হইতে পারে--- হিন্দু দর্শন পাশ্চাত্যের দর্শনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। ভারতবাসীর গৌরব ও মর্যাদা বৃদ্ধি হইতে পারে। ...প্রশ্ন উঠিতে পারে ইহাতে লাভ কী? প্রথমত, সত্যপ্রচারের যে লাভ, সে লাভ তো আছেই; দ্বিতীয়ত, অসভ্য অথবা অর্ধসভ্য আফ্রিকাবাসী হিন্দুধর্ম ও সভ্যতার আলোক পাইয়া সুসভ্য হইয়া উঠিবে; তৃতীয়ত, Aggressive হওয়ার ফলে হিন্দুধর্ম আরও শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিবে এবং বিভিন্ন দেশে প্রচারের ফলে বাধ্য হইয়া অনেকগুলি গোঁড়ামি ও কুসংস্কার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। বিশ্বের মধ্যে ভারতের স্থান আরও উচ্চ হইবে' (সমগ্র রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ১৪-১৫)।

মহানিষ্ক্রমণের আগে লালগোলা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক যোগীরাজ বরদাচরণ মজুমদারের কাছে ক্রিয়াযোগের দীক্ষা নেন সুভাষ। বরাদাচরণের কথায়, 'তাঁকে যোগের বিশেষ প্রক্রিয়া বলে দিলাম। ধ্যানে বসিয়েছিলাম, অনেকক্ষণ ধ্যানস্থ ছিলেন।' 'পুরাণ পুরুষ যোগীরাজ শ্রীশ্রী শ্যামাচরণ লাহিড়ী' গ্রন্থে সুভাষচন্দ্রের ক্রিয়াযোগে দীক্ষিত হওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়।

বাস্তববাদী রাজনৈতিক নেতা হওয়া সত্ত্বেও সন্ন্যাস ধর্মের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল চিরকাল। আজাদ হিন্দ সরকারের প্রচারমন্ত্রী এস.এ. আইয়ার তাঁর 'Unto Hind a witness' গ্রন্থে লিখেছেন : 'Sannyasi was writ lerge on his forehead even when the Supreme Commander's cap rested majestically on his head at an alluring angle over his right brow.' (Page-268)

সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ সরকারের প্রধান কার্যালয় যখন স্থাপন হয় সেই সময় নেতাজী প্রায়ই গভীর রাতে সবার অগোচরে স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনে যেতেন এবং পট্টবস্ত্র পরিধান করে 'shut himself up in the prayer room, rosary in hand and spent a couple of hours in meditation.' (P.-269)

এইরকম বহু উদাহরণ ও ঘটনা আছে যার মাধ্যমে হিন্দুত্বের প্রতি সুভাষচন্দ্রের গভীর ভালোবাসার কথা জানা যায়।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুই আধুনিক ভারতের পথপ্রদর্শক

মলয় দাস

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ভাবনা এবং দার্শনিক বীক্ষার এক বড়ো অংশ জুড়ে ছিল আধুনিক ভারত গড়ে তোলার স্বপ্ন। পরাধীনতার গ্লানিমুক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি কী হবে বা কী হওয়া উচিত— সে সকল বিষয় সম্পর্কে তিনি স্বীয় ধারণা ব্যক্ত করেছেন তাঁর বিবিধ প্রবন্ধ ও পত্রালাপে। এই সকল রচনা থেকে তৎকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতি, রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, সমসাময়িক বিবিধ মত ও মতাদর্শ সম্পর্কে তাঁর সুগভীর জ্ঞান ও বিশ্লেষণ সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। এই আলোচনা প্রসঙ্গেই তিনি 'যুব আন্দোলন' বিষয়ক প্রবন্ধাবলীর এক জায়গায় লিখেছেন, 'আপনারা জানেন যে Marxism-এর তরঙ্গ এদেশে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে; এই তরঙ্গের আঘাতে কেহ কেহ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। Karl Marx-এর মতবাদ পূর্ণরূপে গ্রহণ করিলে আমাদের দেশ যে সুখসমৃদ্ধিতে ভরিয়া উঠিবে এ কথা অনেকে বিশ্বাস করেন এবং দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহারা রাশিয়ার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। কিন্তু আপনারা হয়তো জানেন যে, রুশিয়াতে যে বলসেভিজম্ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে— তাহার সহিত Marxian Socialism-এর মিল যতটা আছে— পার্থক্য তদাপেক্ষা কম নয়। আজ যদি Karl Marx জীবিত থাকিতেন, তাহলে তিনি রাশিয়ার বর্তমান অবস্থা দেখিয়া কতটা সুখী হইতেন সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। Karl Marx বিশ্বাস করিতেন যে তাঁহার সামাজিক আদর্শ একই ভাবে রূপান্তরিত না হইয়া সকল দেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। এ সব কথার অবতারণা করার উদ্দেশ্য এই যে, আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাই যে, আমি অন্য দেশের আদর্শ বা প্রতিষ্ঠান অন্ধভাবে অনুকরণ করার বিরোধী' (তরুণের স্বপ্ন, পৃ. ১৩৫)।

সুভাষচন্দ্রের চিন্তাধারা অনুযায়ী প্রত্যেক দেশের জাতীয় প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি হয় এবং হওয়া উচিত সেই দেশের নিজস্ব ইতিহাসের ধারা, ভাবাদর্শ ও ব্যবহারিক জীবনের আঙ্গিক অনুসারে। তদনুযায়ী একটি দেশের জাতীয় ভাবনা গড়ে তোলার প্রশ্নে সেই দেশের মানুষের ইতিহাসসিদ্ধ জীবনবোধ অগ্রাহ্য করা সম্ভব বা সমীচীন নয়। তাঁর মতে, কোনও দেশের কোনও প্রাতিষ্ঠানিক ভাবনা বা তত্ত্ব অপর একটি দেশে রোপণ করলে সুফলদায়ক হওয়া অপেক্ষা ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনাই অধিকতর (ঐ, পৃ. ১৩৫)। প্রতিটি দেশ ও জাতির একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ধারা আছে, নিজস্ব একটি ইতিহাস আছে। সেই সংস্কৃতি ও ইতিহাসের গর্ভ হতে, তার রসে জারিত হয়েই জন্ম নেয় সেই দেশ ও জাতির রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শ। ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়েই সেই আদর্শ প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী হয়ে ওঠে। একটি দেশ ও জাতি পায় তার এগিয়ে চলার অবলম্বন। তিনি গীতায় শ্রীকৃষ্ণের বাণী 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্ম ভয়াবহঃ' স্মরণপূর্বক বলছেন, 'আমি এই উক্তিতে বিশ্বাস করি'। (ঐ, পৃ. ১১) স্বাধীন ও আধুনিক ভারতের যে রূপরেখা তিনি এঁকেছেন, সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে, ১. পূর্ণ সাম্যবাদ। ২. জাতিভেদ প্রথার বিলোপ। ৩. নারীজাতির সর্বাঙ্গীণ মুক্তি। ৪. আর্থিক বৈষম্য দূরীকরণ। ৫. বর্ণ, ধর্ম, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণ। (ঐ, ১৩১-১৩২) ৬. ব্যক্তির আপন বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমষ্টির বিকাশ (ঐ, পৃ. ১২২)।

আধুনিক ভারতে উল্লিখিত রূপরেখার বাস্তবায়নের ভিত্তিস্বরূপ অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি বলছেন, 'পরাধীন দেশে যদি কোনও ইজম্ সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতেই হয়, তবে তা ন্যাশনালিজম্' (ঐ, পৃ. ১৩৫)। তিনি 'জাতীয়তাবাদ' বলতে এখানে পাশ্চাত্য সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের কথা বলেননি। তাঁর জাতীয়তাবাদের ধারণা জন্ম নিয়েছে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্তভাবনা এবং ধর্মীয় বিচারধারা হতে। তিনি বলছেন, রামকৃষ্ণ পরমহংস নিজের জীবনের সাধনার ভিতর দিয়া সর্বধর্মের যে সমন্বয় করিতে পারিয়াছিলেন তাহাই স্বামীজীর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল এবং ভবিষ্যৎ ভারতের জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি। সর্বধর্ম সমন্বয় এবং সকল মত সহিষ্ণুতার প্রতিষ্ঠা না হইলে এই বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে জাতীয় সৌধ নির্মিত হইতে পারিত না (ঐ, পৃ. ৯৪)। নেতাজী মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, ভারতের শিক্ষার মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা বিশ্বমানবের পক্ষে অতি

প্রয়োজনীয় এবং যা গ্রহণ না করলে বিশ্বসভ্যতার প্রকৃত উন্মেষ হবে না (ঐ, পৃ. ১৪)। সেই কিছু একটা হলো 'আধ্যাত্মিকতা'। স্বামীজী যাকে ভারতবাসীর 'অন্তরাত্মা' বলেছেন। আধ্যাত্মিকতার মধ্যেই নিহিত ভারতের জাতীয়তাবোধ, এই দেশের পুনরুত্থানের শক্তি।

স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, 'আমাদিগকে আমাদের প্রকৃতি অনুযায়ী উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। বৈদেশিক সংস্থাগুলি জোর করিয়া আমাদিগকে যে প্রণালীতে চালিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, তদানুযায়ী কাজ করার চেষ্টা বৃথা; উহা অসম্ভব। আমি অন্যান্য জাতির সামাজিক প্রথার নিন্দা করিতেছি না। তাহাদের পক্ষে উহা ভালো হইলেও আমাদের পক্ষে নহে। তাহাদের পক্ষে যাহা অমৃত, আমাদের পক্ষে তাহা বিষবৎ হইতে পারে। আমরা স্বভাবতই আমাদের সংস্কার অনুযায়ী চলিতে পারি এবং আমাদিগকে সেইরূপ করিতে হইবে' (বিবেকানন্দ, ভারতের পুনর্গঠন, পৃ. ১৫-১৬)।

সুভাষচন্দ্রের ভাবনাতেও অভিন্ন অভিব্যক্তি প্রতিফলিত। এদেশের বর্তমান ও আগামীর সোপান নির্ণীত ও স্থিরীকৃত হবে আপন সংস্কার ও ঐতিহ্যর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। সনাতন ভারতীয় ঐতিহ্য এবং প্রবাহমান সমাজের গতিপথ চিহ্নিতকরণ প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন, 'আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যতদিন না তোমরা প্রকৃতপক্ষে ধার্মিক হইতেছ, ততদিন ভারতের উদ্ধার হইবে না। ধর্মই যে ভারতের প্রাণ, ধর্ম লুপ্ত হইলে ভারতও মরিয়া যাইবে। এই জন্য ভারতে যে-কোনো সংস্কার বা উন্নতির চেষ্টা করা হউক, প্রথমত, ধর্মের উন্নতি আবশ্যক। ভারতকে সামাজিক বা রাজনীতিক ভাবে প্লাবিত করার আগে প্রথমে আধ্যাত্মিক ভাবে প্লাবিত কর' (ঐ, পৃ. ১৬)।

তিনি বলছেন, 'আমি দৃঢ়ভাবে বলিতেছি, হিন্দুসমাজের উন্নতির জন্য ধর্মকে নষ্ট করিবার কোনো প্রয়োজন নাই ও ধর্মের জন্যই যে সমাজের এই অবস্থা তাহা নহে, বরং ধর্মকে সামাজিক ব্যাপার যেভাবে কাজে লাগানো উচিত, তাহা হয় নাই বলিয়াই সমাজের এই অবস্থা। আমি আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ হইতে ইহার প্রত্যেকটি কথা প্রমাণ করিতে প্রস্তুত। সমাজের এই অবস্থাকে দূর করিতে হইবে ধর্মকে বিনষ্ট করিয়া নহে, পরন্তু হিন্দুধর্মের মহান উপদেশসমূহ অনুসরণ করিয়া' (বিবেকানন্দ, পৃ. ১৬)।

স্বামীজীর এই চিন্তারই প্রতিরূপ আমরা খুঁজে পাই তাঁর পূর্বজ দুই মহীরূহ রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিন্তন ও কর্মে। উভয়েরই সমাজ সংস্কারের পেছনে ছিল ধর্মীয় সংস্কার। সনাতন ধর্মের মূল শাস্ত্রসমূহ বিশ্লেষণ করে তাঁরা দেখিয়েছিলেন, তৎকালীন ধর্মীয় বিধানের নামে যে সকল অবদমনমূলক প্রথা চলছে, তা বাস্তবে সনাতন ধর্মবিরুদ্ধ। দমনমূলক রীতিনীতি এবং লিঙ্গবৈষম্য প্রকৃত বৈদান্তিক ভাবনার প্রতিফলন নয়, বরং বৈদান্তিক আদর্শের চূড়ান্ত বিকৃতি তা তাঁদের রচনায় প্রকাশ পায় এবং মান্যতা পায়। উল্লেখ্য, 'তুলনামূলক ধর্মশাস্ত্র' বলে ইদানীংকালে যা শোনা যায়, রামমোহন রায় অনুপ্রাণিত 'ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন' এবং স্বামী বিবেকানন্দের 'সর্বজনীন ধর্ম' ভাবনায় বহু পূর্বেই তা প্রকাশিত। ধর্মসহিষ্ণুতার বার্তা যেখানে প্রতিধ্বনিত। মধ্যযুগে বিবিধ সময়ে সামাজিক অসাম্য এবং অচ্যুত প্রথার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে যে ভক্তি আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তার মূলেও ছিল আধ্যাত্মিকতা। রামানুজ, সাধু দীনেশ্বর, নামদেব, রমানন্দ, গুরুনানক, বল্লভাচার্য, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, কবীর, দাদু, একনাথ, তুকোরাম, গুরু রামদাস, প্রমুখ যুগপুরুষের ভক্তি আন্দোলনের মূলেও ছিল আধ্যাত্মিকতা। দুই সহস্র বছরেরও আগে বুদ্ধদেব ও জৈন তীর্থঙ্করদের মাধ্যমে অহিংসাআশ্রিত ভাবধারা বিস্তারের মূলেও সেই অধ্যাত্মিকতা। চণ্ডাশোক অশোককে আমরা ইতিহাসে যে ধর্মাশোকে রূপান্তরিত হতে দেখি তার মূলেও আধ্যাত্মিকতা। ভারতীয় সমাজজীবনের

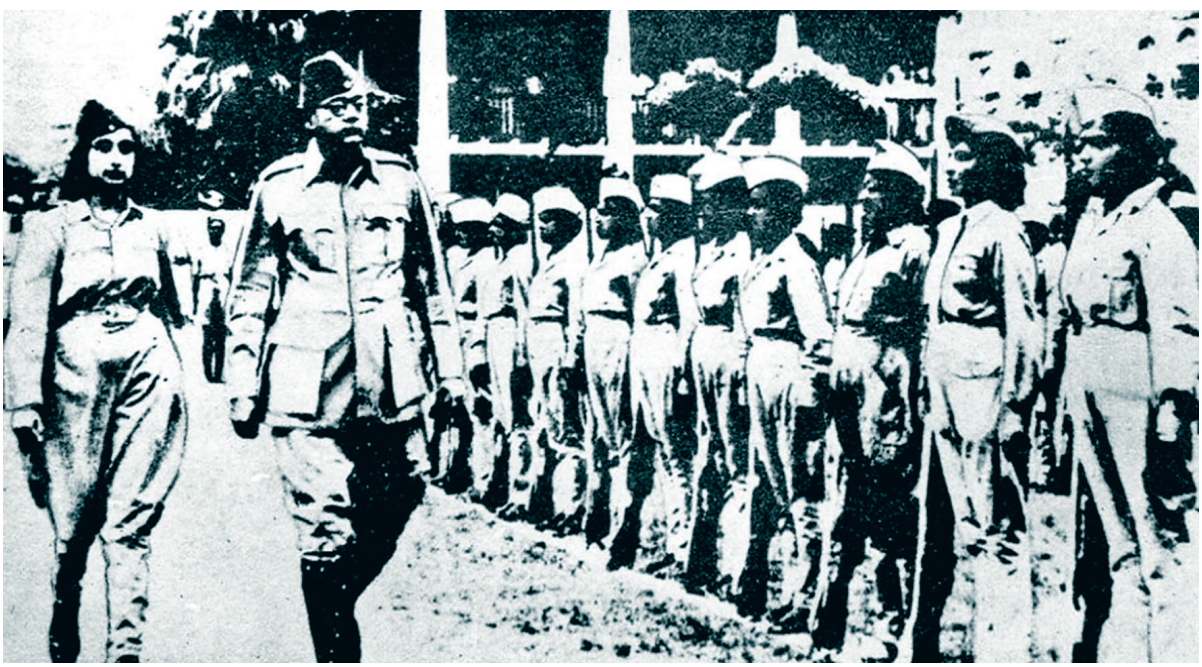

ফঃ ৪

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ধর্মীয় ভাবাবেগ চিরকাল এদেশের মানুষের জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। সময়ে সময়ে ধর্মীয় ভাবাবেগ কুরীতির অন্ধগলিতে যখন পথ হারিয়েছে, আধ্যাত্মিকতা তাকে রক্ষা করেছে। ধর্মীয় আচার-বিচার ধর্মের বহিঃরঙ্গ মাত্র; আধ্যাত্মিকতা ধর্মের অন্তরঅঙ্গ, যা মানুষে মানুষে ভেদ স্বীকার করে না। আধ্যাত্মিক ভাবনাপ্রসূত সাম্য ভারতবর্ষের প্রকৃত সত্য। স্বামী বিবেকানন্দের ফলিত বেদান্তে সেকথাই বর্ণিত। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু সেই ভাবনারই ধারক ও বাহক। ভারতবর্ষের ইতিহাসনিষ্ঠ সনাতন আদর্শই তাঁর জাতীয়তাবোধের ভিত্তিভূমি।

অন্যদিকে, মার্কসবাদী সমাজভাবনায় আমরা অন্যচিত্র পাই। কার্ল মার্কস তাঁর 'হেগেলের আইনের দর্শনের পর্যালোচনা' শীর্ষক প্রবন্ধে বলছেন, 'মানুষ ধর্ম তৈরি করে, ধর্ম মানুষকে তৈরি করে না। এই রাষ্ট্র, এই সমাজ সৃষ্টি করে ধর্ম, একটা ওলটানো জগৎ-চেতনা, কেননা সেগুলো হলো একটা ওলটানো জগৎ... এটি হলো মানব সারধর্মের উদ্ভট বাস্তবায়ন... ধর্ম হলো জনগণের জন্য আফিম। মানুষের মায়াময় সুখ হিসেবে ধর্মকে লোপ করাটা হলো মানুষের প্রকৃত সুখের দাবি করা। ধর্মের সমালোচনা মানুষকে মোহমুক্ত করে, তাতে সে মোহমুক্ত বিচারবুদ্ধি পাওয়া মানুষের মতো ভাবতে, কাজ করতে, নিজ বাস্তবতা গড়ে তুলতে পারে... ধর্ম শুধু অলীক সূর্য যা মানুষকে কেন্দ্র করে ঘোরে... (মার্কস ও এঙ্গেলস, পৃ. ৩৯-৪০)।

মার্কসের উল্লিখিত ভাবনায় প্রতিভাত, ধর্ম মানুষের বাস্তব ধারণা উপলব্ধির পথে একটি আবরণ। এই আবরণ উন্মোচনেই মানুষ সমাজ এবং তার প্রকৃতিকে যথার্থরূপে বুঝতে শিখবে। ধর্মের মোহ থেকে সকলের তাই বের হয়ে আসা উচিত। মার্কসের এই ভাবনায় ধর্মের বহিঃরঙ্গকেই ধর্ম রূপে ভাবা হয়েছে। ধর্মের বহিঃরঙ্গ ও আধ্যাত্মিকতা উভয়ের মধ্যে যে সূক্ষ্ম কিন্তু গভীর পার্থক্য রয়েছে, তাই এই ভাবনায় অনুপস্থিত। অবশ্য, মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের ধর্মসম্পর্কিত সমালোচনায় মূলত সেমেটিক ধর্মগুলিরই উল্লেখ করেছিলেন। একথা অনস্বীকার্য, ভারতীয় ভাবনায় 'ধর্ম' অনেক ব্যাপকতর অর্থে বোধিত। এদেশের আধ্যাত্মিক ভাবনা, শিল্প-সাহিত্য-সংগীত হতে সান্ধ্য অবসর মনুষ্যজীবদের পরতে পরতে পরিব্যপ্ত। মার্কসবাদী ভাবনায় আমরা পাই ঠিক এর বিপরীত ছবি। মার্কসবাদী ভাবনায় যে শ্রেণীদ্বন্দ্বের মাধ্যমে শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজভাবনার কথা বর্ণিত, তার ব্যবহারিক প্রয়োগ ও সাফল্য সম্পর্কে পাশ্চাত্য অনেক চিন্তাবিদ বহু আগেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে অস্বাভাবিকতার কিছু নেই। যে কোনো দার্শনিক তাত্ত্বিক আলোচনার পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি থাকে, থাকবেই। ঘটনা হচ্ছে, গত শতাব্দীতে মার্কসবাদী ভাবনা অনুসারী আর্থ সামাজিক ব্যবস্থা গঠনের যে জোয়ার এসেছিল পৃথিবীব্যাপী, সেই শতাব্দীর শেষ কয়েক দশক হতেই তার প্লাবন স্তিমিত হয়ে আসে। সাবেক সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের পতন ঘটে, কমিউনিস্ট দেশগুলিতে ধীরে ধীরে উন্মুক্ত অর্থনীতি এবং সমাজবোধ ফিরে আসে। বাজার অর্থনীতি, ব্যক্তিগত বৃহৎ পুঁজি পুনরায় জায়গা করে নিয়েছে বা এর প্রবণতা স্পষ্ট হাল আমলের কমিউনিস্ট দেশগুলিতেও।

ধ্রুপদী মার্কসবাদ আজ অস্তাচলে, স্থান করে নিতে চাইছে বিভিন্ন ধারার নব্যমার্কসবাদ। বৃহৎ ব্যক্তিগত পুঁজি ও ধর্ম দিন বদলের ভাবনায় আজ অচ্ছুত নয়— এমনতর চিন্তা নব্যমার্কসবাদী ধারণায় রীতিমতো জায়গা করে নিচ্ছে। Otto Maduro, যিনি একজন নব্যমার্কসবাদীরূপে গণ্য, তিনি বলছেন, '...that in some societies, religion might actually be the only institution through which people can organise for radical social change.' 'মার্কসবাদের উত্থান ও পতন', 'মার্কসবাদের পটভূমিতে ধর্ম ও অধ্যাত্মিকতার পুনর্মূল্যায়ন' ইত্যাদি আজ সমাজ ও রাষ্ট্রতত্ত্বের অন্যতম আলোচিত বিষয়। ইতিহাস বলছে, মাত্র এক শতাব্দীর মধ্যেই মার্কসবাদভিত্তিক গড়ে ওঠা সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে অধ্যাত্মিকতা নির্ভর ভারতীয় সমাজব্যবস্থা সাড়ে হাজার হাজার বছরেরও প্রাচীন এবং বহু ঘাতপ্রতিঘাত সত্ত্বেও আজও একইভাবে প্রবহমান। এর থেকেই প্রমাণিত হয়, ভারতীয় সমাজ ও জাতীয় জীবনে আধ্যাত্মিকতার গুরুত্ব ও অনিবার্যতা। আধ্যাত্মিকতা ব্যতিরেকে মানুষের ধর্মীয় জীবনকে উপেক্ষা করে বর্তমান ও আধুনিক ভারতবর্ষ গঠনের কল্পনা নিছক এক দিবাস্বপ্ন মাত্র।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বহু আগেই এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন এবং ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে মার্কসবাদ সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায় আধুনিক ভারতবর্ষ গঠনের পরিকল্পনায় মার্কসবাদের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে গভীর সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, বহু ভাষা-ধর্ম-মত-সংস্কৃতির মিলনভূমি ভারতবর্ষে জাতীয়তাবোধের বীজ কোনো বৈদেশিক ভাবনায় নেই, তা প্রোথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বেদান্তভাবনায়; প্রয়োজন সেই ভাবনার রক্ষণ ও পরিচর্যার। উল্লেখ্য, শ্রীবিপিন চন্দ্র পাল বলেছেন, 'আধুনিক ভারতীয় জাতীয়তা স্বামী বিবেকানন্দেরই সৃষ্টি।' সমমত পোষণ করেছিলেন অ্যানি বেসান্ত। গান্ধীজী স্বীকার করেছিলেন, বিবেকানন্দের রচনাবলী পাঠে তাঁর দেশপ্রেম শতগুণে বেড়ে গিয়েছে। তাঁর হরিজন আন্দোলনের মূলে ছিল স্বামীজীর শূদ্র জাগরণ এবং তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ভাবনা। বাস্তবে এই আন্দোলন ছিল জাতীয় সংহতি স্থাপনেরই একটি প্রয়াস। ঋষি অরবিন্দ হতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তৎকালীন মনীষীগণের প্রত্যেকেই স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনায় খুঁজে পেয়েছিলেন আধুনিক ভারতবর্ষের সোপান। স্বামীজীর ভাবশিষ্য, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বপ্নের পুরুষ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন, 'বিবেকানন্দই তাঁর আদর্শ'। তিনি বিবেকানন্দের বেদান্তপ্রসূত জাতীয়তাবাদী ভাবনার আলোকেই আধুনিক ভারতবর্ষ গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং স্বামীজীর মতোই আশা রেখেছিলেন, প্রকৃত জাতীয়তাবাদী ভাবনার যথার্থ রূপায়ণের মাধ্যমে ভারতবর্ষ তাঁর অতীত গৌরব অপেক্ষাও অধিকতর গৌরবময় হয়ে উঠবে। স্বামীজীর মতোই তিনি ছিলেন শ্রীমদ্ভগবত গীতার একনিষ্ঠ ভক্ত। তিনি বলেন, 'The voice of Krishna was the voice of immoral truth' (তরুণের স্বপ্ন, পৃ. ১২৫)।

বিবাহের বার্তা ছড়িয়ে নেতাজীকে কলঙ্কিত করার অপচেষ্টা

কল্যাণ গৌতম এবং সৌকালিন মাঝি

তিনি 'আধুনিক ভারতের ভীষ্মদেব'। তাঁর চরিত্রের বিপ্রতীপে একদল অন্ধকার জগতের মানুষ, যাদের নানান স্বার্থ, অফুরন্ত লোভ, বিবিধ রাজনৈতিক প্রত্যাশা। নেতাজী তাঁর পরিবারের একজন হলেও, তিনি পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নন। এক অসম্ভব পরাক্রমশালী আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব, মহান বিশ্বমানব। সুতরাং তাঁকে নিয়ে কথা বলার একচেটিয়া ও একছত্র অধিকার তাঁর পরিবারেরও থাকতে পারে না। নারায়ণ সান্যাল লিখছেন, 'নেতাজী বিবাহিত' এই অসত্যটা মেনে নেওয়ায় কে কোন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সুবিধা ভোগ করেছেন তা গবেষণা করার প্রয়োজন নেই; কিন্তু এই হিমালয়ান্তিক মিথ্যাচারকে অপসারণ করে নেতাজীর প্রকৃত জীবনী রচিত হয়নি।

১৯৪৯ সালের ২২ এপ্রিলের প্রভাতে হিন্দি দৈনিক পত্রিকা 'সন্মার্গ'-এর বেনারস সংস্করণের একটি সংবাদে চমকে উঠলো ভারতবাসী। সংবাদের শিরোনাম ছিল 'নেতাজী কা পত্নী'। প্রতিপাদ্য বিষয়, এক জার্মান রমণীকে বিয়ে করেছিলেন সুভাষ, তাদের আট বছর বয়সী এক পুত্র সন্তান রয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে দেশবাসী বিস্মিত, হতচকিত, আহত হলো। এ কী করে সম্ভব! দু' বছর অতিক্রান্ত হবার পর আবারও 'বোমা'! ওই পত্রিকাতেই খবর, সুভাষচন্দ্রের বিবাহ এক জার্মান মহিলার সঙ্গে, রয়েছে এক কন্যা সন্তান। দু'বার দু'রকম— একবার পুত্র, একবার কন্যা। দু' বছরের ব্যবধানেও সন্তানের বয়স সেই আটই রইল।

প্রথম খবরের সময় যদি সন্তানের বয়স আট হয়, তবে জন্ম হতে হবে ১৯৪১ সালে এবং মাতৃগর্ভে ভ্রূণ তৈরি শুরু হবে আরও ৯ মাস ১০ দিন আগে। অর্থাৎ সহবাস-সঙ্গম করতে হবে ১৯৪০ সালের জুন-জুলাইয়ে। ঘটনাক্রমে সেসময় সুভাষ ছিলেন ভারতবর্ষে। ২ জুলাই তাঁকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা করতে দেখা যায়। ওই দিন দুপুরে সুভাষকে জেলবন্দি করে

ব্রিটিশ সরকার। কিছুদিন প্রেসিডেন্সি জেল, তারপর নিজের বাড়িতে গৃহবন্দি তিনি। এদিকে যাকে বলা হবে সুভাষের স্ত্রী, সেই এমেলিয়ে শেঙ্কেল তখন জার্মানিতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। ব্রিটেন-জার্মানি পরস্পরের শত্রুপক্ষ, অতএব জার্মানিতে না পৌঁছালে গল্প ধোপে টিকবে না বুঝে ষড়যন্ত্রকারীরা দু' বছর অপেক্ষা করে দ্বিতীয় বোমাটা ফাটালেন। ষড়যন্ত্রকারীদের গণিতের হিসেব কিছুটা ভুল হয়ে গেছিল।

বিবাহ-সংবাদের প্রেক্ষিতে উত্তরপ্রদেশের ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা রামগতি গাঙ্গুলি নেতাজীর দাদা শরৎ বসুকে চিঠি লিখলে, তিনি উত্তর দিলেন, এই মিথ্যা সংবাদ উপেক্ষা করুন। দেশবাসী একটি বড়ো ধাপ্পাবাজীর গল্প বুঝতে শুরু করলেন। এক নতুন ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে নেতাজীকে কেন্দ্র করে। দেশপ্রেমের মহান আদর্শকে খানখান করে দিতে চায় কেউ। চুরমার করে দিতে চায় ভাবমূর্তি। প্রশ্ন, বিবাহের সংবাদ এতদিন কেন কোনো গোয়েন্দা সংস্থার কাছে পৌঁছাল না! কেন জার্মান অথবা ইতালি সরকার তা ঘুণাক্ষরেও টের পেল না! জানতে পারলেন না আজাদ হিন্দ ফৌজের কোনো কর্তা ব্যক্তিও।

১৯৫৪ সালের ৩১ মার্চ এমিলিয়ে শেঙ্কল ভাইস কনসালকে লিখছেন, 'Sir, I furnish below particulars of my daughter Anita Schenkl Bose who may be registered as the child of an Indian citizne. Name : Anita, Date of birth : 29.11.1942. Name and address of mother. Frau Emilie Schenkl, Ferrogasse 24, Vienna XVIII (Austria). এই চিঠির সঙ্গে বার্লিন থেকে শরৎ বসুকে লেখা সুভাষের চিঠি (৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩)-কে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন এমিলিয়ে এবং তা 'জাল' বলে দাবি তথ্যভিজ্ঞ মহলের।

নেতাজী-এমিলিয়ের বিবাহের সার্টিফিকেট পাওয়া যায়নি। অনিতার বার্থ সার্টিফিকেট যা পাওয়া গেছে তাতে পিতার নাম সুভাষচন্দ্র নয়। জার্মান ভাষায় অনিতার বার্থ সার্টিফিকেটে মেয়ে ও মায়ের নাম দেওয়া আছে যথাক্রমে Anita Brigitte Schenkl এবং Emilie Karoline Schnkl. ডা. মধুসূদন পাল তাঁর গ্রন্থে নেতাজীর বিবাহ-ষড়যন্ত্র নিয়ে উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন তুলেছেন। আউসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি হিসেবে অনিতার পরিচয়ে রয়েছে Dr. Anita Brigitte Pfaff. 'পাফ' পদবীটি বিবাহসূত্রে পেলেন, তবে 'ব্রিজেটি' শব্দটি কোন পদবীর ধারাবাহিকতা? তবে কি 'ব্রিজেটি' পদবীধারী কেউ ছিলেন তাঁর আসল পিতা?

এমিলিয়ের বিবাহের তারিখের মধ্যেও রয়েছে নানান অসঙ্গতি। উইকিপিডিয়া অনুযায়ী বিবাহ ১৯৪২-এ। তিনি শেখর বসুকে জানিয়েছেন ১৯৪১ সাল। ১৯৭৭-এ কলকাতা হাইকোর্টে শিশির বসুর affidavit অনুযায়ী ১৯৪২; শিশির বোস এবং সুগত বোস সম্পাদিত গ্রন্থে (১৯৯৪) এই তারিখ ১৯৩৭-এর ২৯ ডিসেম্বর।

সাহিত্যিক নারায়ণ সান্যাল এ ব্যাপারে কয়েকটি সূত্র উল্লেখ করেছেন—

১. যদি বিয়ে হয়েই থাকে তবে কী জাতের বিয়ে? ধর্মীয় বিয়ে হলে সুভাষকে খ্রিস্টান হতে

হয় অথবা শেঙ্কেলকে হিন্দু। এখনও পর্যন্ত কেউ এ ব্যাপারে বিজ্ঞাপিত করেননি। ফলে ধর্মীয় বিবাহ অসম্ভব। হলে রেজিস্ট্রি বিবাহ, সিবিল ম্যারেজ।

২. রেজিস্ট্রি হলে রেজিস্ট্রারের নথিতে লিপিবদ্ধ থাকবে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে উদ্ধার যদি নাও হয়, শেঙ্কেল যেহেতু যুদ্ধের পরেও জীবিতা ছিলেন তখন তাঁর কাছে 'ম্যারেজ' সার্টিফিকেট থাকবে না কেন?

৩. সিবিল-ম্যারেজে সাক্ষী থাকার কথা! কিন্তু শেঙ্কেল অথবা অন্যান্য রাজনীতিবিদেরা বিয়ের পক্ষে মত প্রকাশ করলেও প্রত্যক্ষদর্শীর নাম বা সাক্ষীর নাম বলছেন না কেন? বিবাহের আলোকচিত্রও নেই কেন?

৪. বিয়ে সংঘটিত হয়ে থাকলেও হিটলার অথবা জার্মান সরকারের প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল, আমরা পাচ্ছি না। যে সরকারের দৃষ্টিতে শেঙ্কেল একজন আর্য এবং সুভাষ একজন অনার্য ব্রিটিশ প্রজা; সেখানে এত বড়ো ঘটনায় সরকারের কোনো প্রতিক্রিয়া নেই কেন?

৫. জার্মনিতে নেতাজীর সামীপ্যে যাঁরা ছিলেন তাঁরা কেউ কখনও বলেননি, লেখেননি সুভাষচন্দ্র বিবাহ করেছেন।

৬. শেঙ্কেল কেন বিবাহের পর নিজের পদবী পরিবর্তন করলেন না?

৭. ১৯৪৩-৪৫-এর মধ্যে জার্মানি ও জাপানের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল। নেতাজী আই.এন.এ.-র সর্বাধিনায়ক। অ্যাম্ব্যাসির মাধ্যমে স্ত্রীর সঙ্গে পত্রালাপের সুযোগ ছিল। অথচ শেঙ্কেলের কাছে এমন কোনও চিঠি পাওয়া যায়নি। কেন?

৮. ১৯৪৪-৪৫-এ জার্মানিতে যখন কার্পেট বম্বিং চলছে সুভাষ কি কূটনৈতিক চ্যানেলে জানতে চেয়েছেন, তাঁর স্ত্রী ও কন্যা জীবিত আছেন কি না?

৯. ৪৫ সালের ১৮ আগস্টের পর আই.এন.এ বিচারের সময় বা ভারত স্বাধীন হবার পর শেঙ্কেলের আকুলতা জাগেনি কেন? তিনি তাঁর স্বামীর সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন রাখেননি কেন?

১০. ব্যতিক্রম গান্ধীজীকে লেখা একটি চিঠি— তাতে 'শেঙ্কেল' হিসেবে পরিচয়, 'মিসেস বসু' হিসেবে নয় কেন? নেতাজী এবং নেহরু পরিবার যদি শেঙ্কেলকে সুভাষের স্ত্রী এবং অনিতাকে কন্যা বলে মেনেই নেন তবে নেতাজী ভবনের গ্যালারিতে তাদের আলোকচিত্র প্রদর্শিত হলো না কেন?

অভিযোগ উঠেছে কয়েক দশক ধরে তদানীন্তন ভারত সরকার (নেহরু, প্যাটেল এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকার) এবং কিছু বিক্রি হয়ে যাওয়া মিডিয়া এবং নেতাজী পরিবারের সদস্যরা এমিলিয়ে শেঙ্কল এবং অনিতা পাফকে নেতাজীর স্ত্রী এবং কন্যা হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছে। দাবির সমর্থনে কোনো কার্যকরী কাগজপত্র, রেকর্ড বা নথি এখনও দেখাতে পারলেন না কেন? ১৯৪১ সালের জানুয়ারি মাসে নেতাজী কলকাতার এলগিন রোডের বাড়ি থেকে বন্দি অবস্থায় অলৌকিকভাবে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর ভারতবাসী বার্লিন রেডিয়ো থেকে তাঁর কণ্ঠ শুনতে পেলেন। তিনি হয়ে উঠলেন হৃদয়-সম্রাট। তাঁর কৃতিত্ব, আই.এন.এ-র বীরগাথা প্রতিটি ভারতীয়কে মন্ত্রমুগ্ধ করল। তারপর তাইহোকু থেকে তথাকথিত মৃত্যুর খবর, লালকেল্লায় আই.এন.এ সৈন্যদের বিচার সবকিছুই ভারতীয় মননকে তীব্র ঘৃণায় ব্রিটিশ-মানস থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছিল। সাধারণ মানুষ তাকে মৃত বিশ্বাস করতে নারাজ। ব্রিটিশ ও আমেরিকান গোয়েন্দারা তাকে খুঁজতে পৃথিবীর প্রতিটি কোণে তাণ্ডব চালালো। আমরা এমন কিছু কি খুঁজে পেলাম, যেখানে কোনো একজন ব্রিটিশ অথবা আমেরিকান গোয়েন্দা নেতাজীর তথাকথিত বিবাহ সম্পর্কে কোনও প্রতিবেদনে এমন কিছু উল্লেখ করলেন যা থেকে বলা যাবে তাঁর একজন স্ত্রী এবং পুত্র অথবা কন্যা ছিল? যদি থাকত, তবে কী কোনও রেফারেন্সে, কোনো ইন্টারসেপশনে, রিপোর্টে, কোনও বক্তৃতায়, নেতাজীর পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে তা লিবিবদ্ধ থাকত না?

শেঙ্কল একদা তাঁর দেশে বিঠল ভাই প্যাটেলের (সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের দাদা) ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন। বিঠলভাই একজন ধনী ব্যক্তি ছিলেন এবং সচিব রাখার ক্ষমতা ছিল তাঁর। সুভাষের সঙ্গে বিঠল ভাইয়ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তখন সুভাষ চন্দ্র বসু নির্বাসিত ছিলেন (১৯৩৩-৩৭) এবং আর্থিক ভাবে দুর্বল ছিলেন, তাই নিজের জন্য পূর্ণকালীন সচিবের খরচ বজায় রাখতে পারেননি। যখন সুভাষ তাঁর 'Indian Struggle' বই লিখছিলেন, বিঠল ভাইয়ের নির্দেশে ও সহায়তায় সুভাষকে সাহায্য করেছিলেন শেঙ্কল, বইটি টাইপ করে দিয়ে। লেখক সুভাষ বইয়ের মুখবন্ধে তা স্বীকারও করেছেন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। এতে দোষের কিছু থাকতে পারে না। সমসাময়িক অস্ট্রিয়ায় ইংরেজি জানা স্টেনোগ্রাফার পাওয়া কঠিন ছিল। বিঠল তাই শেঙ্কলের নাম প্রস্তাব করেন। শেঙ্কল স্থানীয় বাসিন্দা। নিজের বাড়ি থেকে দৈনিক আসতেন, ডিক্টেশন নিতেন, কাজ করতেন এবং ফিরে যেতেন। দুজনের মধ্যে কোনো ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে বলে শোনা যয়নি। তথাকথিত 'জালচিঠি'-তেও কিন্তু স্ত্রী ও কন্যার নাম প্রকাশ করা হয়নি। অনেকেই মনে করেন চিঠিটি ভুয়ো।

অনেকে বলেন গল্প রচনার পিছনে মাউন্টব্যাটেন, নেহরু, প্যাটেলের মতো ব্রিটিশপন্থী ভারতীয় সহযোগীরা ছিলেন। তারা একাধিক অশুভ উদ্দেশ্যে অপপ্রচারের কাজ করেছিলেন ও চালিয়ে গেছেন। যেহেতু বিশ্বাস করানো ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছিল নেতাজী তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। পরিস্থিতি তাদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল, নেতাজী ফিরে এলে তাদের পক্ষে ক্ষমতায় টিকে থাকা মুশকিল হতো। জনগণের সঙ্গে তর্ক করা সম্ভব হতো না। নেতাজী যতদিন ভারতবাসীর মনে বেঁচে ছিলেন ততদিন অবিভক্ত ভারতের স্বপ্ন অম্লান ছিল। অবিভক্ত ভারতের স্বপ্ন ছিল জিন্নাহ, নেহরু এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জন্য বড়ো বিপদ। সেজন্য প্রয়োজন ছিল (১) নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ভাবমূর্তিকে কলঙ্কিত করা, (২) বিমান দুর্ঘটনা এবং বীরের মৃত্যুর মাধ্যমে মিথ্যা কাহিনি সমাজে প্রতিষ্ঠা করা যাতে মহান মৃত রাষ্ট্রনায়কের ভাবমূর্তি ধীরে ধীরে মানুষের মন থেকে মুছে যায়, অনুসারীদের মনকে ক্রমশ হতাশ করে তোলে। এই জন্যই 'নকল স্ত্রী' এবং নকল কন্যা'র গল্পফাঁদা হয়েছিল এমনটাই অভিযোগ। যেহেতু কোনো পাকাপোক্ত প্রমাণ এখনও পাচ্ছি না নেতাজীর বিবাহ সম্পর্কে, তাই এই বিষয় বিশ্বাস বা মন্তব্য কোনোটাই করা উচিত নয় আমাদের। দিনের শেষে মনে রাখতে হবে, তিনি সুভাষ চন্দ্র বোস, এমন একজন ব্যক্তি যিনি প্রয়োজনে নিজের মৃত্যুটাও অভিনয় করে যেতে পারেন।

তথ্যসূত্র : *নারায়ণ সান্যাল, ১৯৭০ (ষোড়শ সংস্করণ ২০২২), আমি নেতাজীকে দেখেছি, দে'জ পাবশিলিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা-xiv-xv. ২. ডাঃ মধুসূদন পাল, ২০২০, বিবাহ গল্প কথা শয়তানের গুপ্ত গাথা, বজ্রবাণী ট্রাস্ট, কলকাতা। ৩. ডাঃ মধুসূদন পাল ও শুভময় মণ্ডল, ২০২০, Decoding Marriage stories on Netaji বজ্রবাণী ট্রাস্ট, কলকাতা।*

নদী থেকে দেবীতে রূপান্তরিত হয়েছেন মা সরস্বতী

রামানুজ গোস্বামী

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বলা হয়েছে—

'গৌরীদেহাৎ সমুদ্‌ভূতা যা সত্ত্বৈকগুণাশ্রয়া।
সাক্ষাৎ সরস্বতী প্রোক্তা শুম্ভাসুর-নিবর্হিণী।।'

স্পষ্টতই এটা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথাই নয় যে, সত্ত্বগুণকে আশ্রয় করেছেন যে দেবী এবং যিনি ভয়ানক শুম্ভাসুরকে নির্ধন করেছেন, তিনিই হলেন দেবী সরস্বতী। বলাই বাহুল্য যে, মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী— দেবী চণ্ডিকারই বিভিন্ন নাম ও রূপমাত্র। বিভিন্ন সময়ে অসুরসংহারের মধ্যে দেবী নানারূপে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীর এই শ্লোকই এই বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ দেয়। এটাও বলা হয়েছে যে, 'মহালক্ষ্মী মহাকালী শৈব প্রোক্তা সরস্বতী'।

বস্তুত, সরস্বতী হলেন বৈদিক দেবী। বিশেষজ্ঞদের মতে, 'ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত, রাত্রিসূক্ত ও শ্রীসূক্তের প্রতিমূর্তিই মহাকালী, মহাসরস্বতী ও মহালক্ষ্মী। আবার মৎস্যসূক্তে রয়েছে—

'যা নিত্যা প্রকৃতির্নিত্যং দুর্গায়া দক্ষিণে স্থিতা।
সারদা ভারতী নিত্যা বামভাগে সদা স্থিতা।।'

আবার এও বলা হয়ে থাকে যে— 'জয়া বামে স্থিতা বিদ্যা বিজয়া চাপি দক্ষিণে'। সুতরাং একথাই বলাই যায় যে, জয়া ও বিজয়া হলেন যথাক্রমে সরস্বতী ও লক্ষ্মীদেবী। উল্লেখ্য যে, দেবী সরস্বতী হলেন বিদ্যার দেবী। তিনি মানুষকে বিদ্যা প্রদান করেন এবং তার ফলে মানুষ জীবনের সকল ক্ষেত্রে উৎকর্ষলাভ করে ও জয়ী হয়ে থাকে। তাই দেবীকে 'জয়া' নামে আরাধনা করা হয়ে থাকে। বস্তুত, জগজ্জননী তথা পরমেশ্বরীই যে সরস্বতী রূপে বিদ্যাপ্রদান করে থাকেন, সেকথা প্রমাণিত হয় বহু সরস্বতী স্তোত্র তথা সরস্বতী কবচেও।

দেবী সরস্বতী প্রসঙ্গে আলোচনায় প্রথমেই যে কথাটি আসে, তা হলো দেবী হলেন বাগ্‌দেবী। শাস্ত্রে বাক্যে সাবিত্রী বলা হয়েছে। আবার এই সাবিত্রীই যে অগ্নি তথা সূর্য, সেকথাও বলা হয়েছে বারেবারেই। তাই দেবী সরস্বতী যে সূর্য তথা অগ্নির আরেক রূপ, সেকথাও নিঃসন্দেহেই বলা যেতে পারে। এই দেবী কোনও কোনও পুরাণমতে ব্রহ্মার দুহিতা। তাঁর বর্ণ শুভ্র বা সাদা। তাঁর বাহন শুভ্র বর্ণের রাজহংস, যা নির্মল জ্ঞান তথা সত্যস্বরূপ পরমাত্মার প্রতীক বলে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, সরস্বতী দেবী জীবকে চৈতন্য প্রদান করে থাকেন। তিনিই এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকারিণী। সাধারণভাবে ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকর্তা বলা হয়ে থাকে। তাঁর বাহনও শ্বেত বর্ণের রাজহংস। এদিক থেকে ব্রহ্মা ও দেবী সরস্বতীর মধ্যে যথেষ্টই সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ৭।৯০।৬ ঋক্‌মন্ত্রে সরস্বতীর প্রকাশক বর্ণ সাদা। কাজেই বোঝাই যাচ্ছে যে, সরস্বতী প্রকৃতপক্ষে বৈদিক দেবী। তাঁকে ত্রিপদা গায়ত্রী নামেও অভিহিত করা হয়েছে। ত্রিপদা বলতে বোঝায় ত্রিপদ সূর্য অর্থাৎ প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকাল। সুতরাং এককথায় এভাবেও বলা যেতে পারে যে, প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে দেবীপূজা সনাতন হিন্দুধর্মে বৈদিক যুগ থেকেই প্রচলিত রয়েছে।

সরস্বতী ও অগ্নি এক ও অভিন্না। বৈদিক-সাহিত্যে ইড়া, সরস্বতী ও ভারতী— এই তিনজন দেবী হলেন বাগ্‌দেবীর সঙ্গে অভিন্না। সায়নাচার্যের মতে, এই তিনজন হলেন অগ্নি বা অগ্নিশিখা। বেদ ছাড়াও বিভিন্ন পুরাণে রয়েছে সরস্বতী-প্রসঙ্গ। নারদীয়, কুর্ম, দেবী প্রভৃতি পুরাণে এবং সারদাতিলক ও কুলার্ণব প্রভৃতি তন্ত্রে সরস্বতীকে মহাদেব ও দুর্গার কন্যা রূপে বলা হয়েছে। আবার, ব্রহ্মাবৈবর্ত পুরাণে দেবী সরস্বতী হলেন শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃতা। বৌদ্ধধর্মেও পাওয়া যায় সরস্বতী-উপাসনা প্রসঙ্গ। বজ্রবীণা সরস্বতী, বজ্র-সারদা, বজ্র-সরস্বতী ইত্যাদি বহু নাম পাওয়া যায় নানাবিধ বৌদ্ধতন্ত্রে। এছাড়াও হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্রে বিভিন্ন নামে দেবী সরস্বতীর উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ভারতের বাইরেও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকারের সরস্বতী মূর্তি পাওয়া যায়।

With Best Compliments from : -

INDER NAHATA

Rang Rez Sarees (P) Ltd.

Manufacturer of Sarees & Kurti

45/1, Rafi Ahmed Kidwai Road

(Near Park Street Police Station)

2nd floor, Kolkata - 700 016

PHONE : 2265-9147, 94330-15473

JALAN JAN KALYAN TRUST

Flat No. 1A, Paramount Apartments

25, Ballygunge Circular Road

Kolkata - 700 019, TEL : 2475-6524, 2475-7760

Fax : 2475-7619, E. mail : madhuban@salyam.net.in

এদের মধ্যে ইন্দোনেশিয়া, তিব্বত, জাপান ইত্যাদি দেশের বিদ্যার দেবী 'বেন-তেন'। এইসব তথ্য থেকে এটাই বলা যায় যে, একসময় হিন্দুধর্মের গৌরব তথা হিন্দুধর্মের প্রভাব-প্রতিপত্তি ভারতের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই ছড়িয়ে পড়েছিল এবং ওই সকল দেশের অধিবাসীরাও হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে হিন্দুদেব-দেবীদের পূর্জার্চনা করতে শুরু করে।

মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতীপূজা করা হয়ে থাকে। ভবিষ্যপুরাণে বলা হয়েছে যে—

'মাঘে মাসি সিতে পক্ষে পঞ্চমী যা শ্রিয়ঃ প্রিয়া।

তস্যামারভা কর্তব্যং বৎসরান্ ষট্ ব্রতোত্তমম্।।'

—দেবী সরস্বতী এই ত্রিভুবনের যাবতীয় বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাই তিনি প্রসন্না হলে মানুষ সর্ববিদ্যায় হয় পারদর্শী, জীবনে হয় সফলকাম, সর্বাভীষ্ট হয় সিদ্ধ। তাই মনোবাসনা পূরণ ও সর্বাঙ্গীণ কল্যাণকামনায় শাস্ত্রে সরস্বতী পূজার বিধান দেওয়া হয়েছে।

এবারে একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা কর যাক। বেদে সরস্বতীর দুই রূপ পাওয়া যায়। একটি তো অবশ্যই দেবীরূপ, অপরটি হলো নদী। তাই বলা হয়েছে যে—

'সরস্বতী ইতি এতস্য নদীবদ্দেকতাবচ্চ নিগমা ভবন্তি।'

১।৩।১২ ঋগভাষ্যে সায়নাচার্যও বলেছেন যে—

'দ্বিবিধা হি সরস্বতী বিগ্রহবদ্দেবতা নদীরূপা চ।'

তবে কোনও কোনও প্রাচীন শাস্ত্রকারের মতে 'সরস্' শব্দের প্রকৃত অর্থ 'জ্যোতিঃ'। তাই সরস্বতী হলেন জ্যোতির্ময়ী দেবী।

উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের একটি বৃহৎ ও পবিত্র নদীরূপেই এই সরস্বতী নদীর কথা জানা যায়। ত্রিবেণী সঙ্গমে এই সরস্বতী নদী অপর দুই পবিত্র নদী গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে বলে মনে করা হয়ে থাকে। বস্তুত, সরস্বতী নদীর উৎপত্তি, গতিপথ ও পরিণতিলাভ ইত্যাদি নিয়ে কোনও একটি মত প্রচলিত নেই। এই ব্যাপারে বিভিন্ন বিতর্ক রয়েছে। মাইকেল ইউটজেলের মতে, 'অমরত্ব ও স্বর্গীয় পরলোকের পথ' হিসেবে দৃষ্ট স্বর্গীয় নদী আকাশগঙ্গা বৈদিক সরস্বতী নদীর উপরিস্থাপিত হয়েছে।' এই প্রসঙ্গে প্রচলিত বিভিন্ন অভিমত সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা হলো— '...সরস্বতী নদীটি পূর্বে যমুনা ও পশ্চিমে শতদ্রু নদীর মধ্যভাগে অবস্থিত; ...গণ্ড্য ব্রাহ্মণ ও জৈমিনীয় ব্রাহ্মণের মতো পরবর্তীকালীন বৈদিক সাহিত্যে এবং মহাভারতেও উল্লিখিত হয়েছে যে সরস্বতী নদী একটি মরুভূমিতে লুকিয়ে গিয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে অসংখ্য গবেষক এই তত্ত্ব উপস্থাপনা করেন যে সরস্বতী নদীটি হলো অধুনা উত্তরপশ্চিম ভারত ও পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ঘগ্গর-হকরা নদী। এই নদীটি যমুনা ও শতদ্রুর মধ্যবর্তী ভূখণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে থর মরুভূমিতে সমাপ্ত হয়েছে।'

...সরস্বতী নদীটিকে দক্ষিণ আফগানিস্তানের হেলমান্দ বা হরাক্ষবতী নদী হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

...এই সূত্র ধরে কেউ কেউ মনে করেন ঋগ্বেদ আরও পূর্ববর্তী যুগে রচিত হয়েছিল। তারা মনে করেন সিন্ধু সভ্যতা আসলে সরস্বতী-সভ্যতা।'

এই সব তাত্ত্বিক আলোচনার থেকে এটা খুব সহজেই অনুমেয় যে, হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিতে দেবী সরস্বতীর স্থান অত্যন্ত উচ্চে যা এক সুউচ্চ মহিমা ও মর্যাদাকেই প্রকাশ করে। তাই খুব সুপরিকল্পিত ভাবেই বিধর্মীরা এবং তথাকথিত বামমার্গী বুদ্ধিজীবীরা দীর্ঘকাল ধরেই দেবী সরস্বতীকে অবমাননা করার প্রচেষ্টা করে চলেছে। এটা যে একমাত্র দেবী সরস্বতীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, এমনটা নয়। সামগ্রিক ভাবেই হিন্দুধর্ম এবং হিন্দু দেব-দেবীদের ক্ষেত্রেই এই ঘটনা ঘটে চলেছে ক্রমাগত। তাই ভারতের জনৈক শিল্পী মা সরস্বতীর নগ্ন চিত্র এঁকে ফলাও করে নিজের শিল্পসত্তা জাহির করেছিলেন এবং তথাকথিত হিন্দু স্বার্থজীবীরা এই ঘটনাকে শিল্পীর স্বাধীনতা বলে ওই শিল্পীকেই সমর্থন করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের জনৈক জনপ্রিয় বাঙ্গালি সাহিত্যিক ঘটা করে দেবী সরস্বতীর প্রতিমার প্রতি নিজের যৌন-বাসনার কথা প্রকাশ্যে জানালেও তথাকথিত স্বার্থজীবীরা সেই লেখকের জয়গানেই ব্যস্ত থাকে। কারণ, তা না হলে ধান্দা চৌপাট হয়ে যাবে। যেহেতু সাধারণ হিন্দুরা সহিষ্ণু, সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে চলে হিন্দু সংস্কৃতিকে কলুষিত করার কাজ।

সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতি বা হিন্দু সংস্কৃতির উপরে আঘাত হানার জন্য ক্রমাগত চলেছে নানাবিধ ষড়যন্ত্র। কোনও একটি দেশ বা সমাজের ক্ষেত্রে যুবসমাজ একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই নানা ভাবে ভারতের যুবসমাজকে বিপথগামী করে দেওয়া, পশ্চিমি সভ্যতার অন্ধ অনুকরণে অভ্যস্ত করে তোলা, হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে বিপথে পরিচালিত করে ধীরে ধীরে পশ্চিমি ও আরব দুনিয়ার দালালিতে অভ্যস্ত করে তোলার চক্রান্ত চলেছে। এই কাজে মদত দেয় ভারতের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, গণমাধ্যমের একটা বিরাট অংশ, কিছু রাজনৈতিক দল।

তাই দীর্ঘকাল ধরেই সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করে ঘটে চলেছে এক ঘৃণ্য ব্যাপার। সরস্বতী পূজার মহিমা বা মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ করে দিনটিকে পশ্চিমি সভ্যতার অনুকরণে 'ভ্যালেন্টাইন্স ডে' হিসেবে বা প্রেমের দিন হিসেবে পালন করবার প্রয়াস শুরু হয়েছে বেশ কিছুকাল ধরেই। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, ইদানীং যুবসমাজের একটা বড়ো অংশ এই সকল কদর্য ব্যাপারে উৎসাহীও হয়ে পড়েছে। তাই প্রতি বছরই এই সরস্বতীপূজার দিনে পার্কে, বিনোদনমূলক স্থানে, সিনেমাহলে যুবক- যুবতীদের অসম্ভব ভিড় লক্ষ্য করা যায়— চলে বহু রকম অশ্লীলতাও। এই সবই আসলে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির উপরে সুপরিকল্পিত আক্রমণ। একটা কথা এক্ষেত্রে অবশ্যই বোঝা দরকার। তা হলো সরস্বতী হলেন বিদ্যা ও জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাই তাঁর পূজার দিনটিকে কদর্যতা বা কালিমালেপন করবার এই যে ঘৃণ্য প্রয়াস শুরু হয়েছে, তার বিরুদ্ধে সরব হওয়ার সময় এসে গিয়েছে। তা না হলে হয়তো বা এমন দিন আসবে যেদিন নবীণ প্রজন্ম সরস্বতী পূজার দিনটিকে পূজার দিন বা বাগ্‌দেবীর আরধানার দিন নয়, প্রেম ও কামনা-বাসনার বিকৃত রূপে উদ্‌যাপনের দিন বলেই মনে করবে। দেশ ও জাতির সেই সমূলে বিনাশের হাত থেকে রক্ষা পেতে চাইলে অবিলম্বে এই সকল ষড়যন্ত্রকে একেবারে গোড়া থেকেই নির্মূল করতে হবে। সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে এই ব্যাপারে অতি অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে।

সরস্বতীপূজা আসন্ন। তাই দেবীর কাছে আমাদের প্রার্থনা দেবীর করুণায় আমরা যেন বিবেক-বুদ্ধি আর সত্যস্বরূপ যে জ্ঞান, সেই পরমার্থ লাভ করে জীবনে ধন্য হতে পারি, আমরা যেন সেই বাক্য বা সেই বচনই প্রয়োগ করি, যা জীবনে অমৃতপরতা এনে দেয়। আমরা যেন সেই কথাই লিখতে পারি যা পরম কল্যাণকর আর মঙ্গলকারী; সুরলোকের সেই ঐশ্বরিক সংগীতেই যেন আমরা একনিবিষ্ট হতে পারি। □

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না

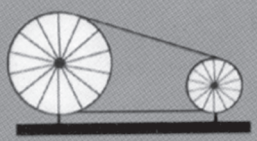

স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম

চির পরিচিত
দুলালের®
তালমিছরি

আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান — দারুণ কাজ দেবে।

ভারত সরকারের R চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন

দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী

দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

সোশ্যাল মিডিয়া গণতন্ত্র রক্ষার অন্যতম হাতিয়ার

অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিগত বেশ কয়েক বছর ধরেই মানুষের জীবনে সোশ্যাল মিডিয়ার ভূমিকা ক্রমবর্ধমান। কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী ছাড়াও সব বয়সের মানুষই এখন ক্রমশ সোশ্যাল মিডিয়ায় স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছেন। বিশেষত ফেসবুক, হোয়াটসআপ, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব প্রভৃতি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ হয়ে গিয়েছে। এর বেশ কিছু ক্ষতিকারক দিক অবশ্যই রয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় অতিরিক্ত আসক্তি বিভিন্ন বয়সের মানুষের নানাবিধ ক্ষতি করছে। সময় নষ্ট, পড়াশোনার ক্ষতি, চোখের ক্ষতি প্রভৃতি তো আছেই। কিন্তু আজ আমরা এর কিছু ইতিবাচক দিক নিয়ে আলোচনা করব। বিশেষত যা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে উপযোগী। ২০১৬ সালেও ১ জিবি ডেটা-র জন্য প্রায় ২৫০ টাকা খরচ করতে হতো। ফলে দরিদ্র ও নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের পক্ষে সোশ্যাল মিডিয়ার সুবিধা পুরোপুরি ভোগ করা সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই সোশ্যাল মিডিয়ায় উপকারিতা ও গুরুত্ব বুঝতে পেরে 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' গড়ে তোলার ডাক দেন। রিলায়েন্স প্রথম নামমাত্র খরচে জিও-র সার্ভিস চালু করে ভারতবর্ষের টেলিকম জগতে বিপ্লবের সৃষ্টি করে। ফলে ডেটার খরচা আগের তুলনায় ৯০ শতাংশের বেশি কমে যায় এবং সাধারণ মানুষের পক্ষেও যথেচ্ছ ইন্টারনেট ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সমস্ত বাধা অপসারিত হয়।

সোশ্যাল মিডিয়ার প্রধান ভূমিকা হলো যে এর ফলে কোনো সত্যকেই আর চাপা দিয়ে রাখা যায় না। ভারতবর্ষে প্রিন্ট মিডিয়া ও টেলিভিশন মিডিয়ার একটি বড়ো অংশ বামপন্থী-কংগ্রেসি-জেহাদি-আরবান নকশাল— এই নেক্সাসের হাতে অবরুদ্ধ। ফলে তারা অনেক সময়ই খবর পরিবেশনের সময়ে অনেক সত্যকে চাপা দিয়ে এবং অনেক অর্ধসত্যকে সত্য বলে চালিয়ে দিত। নানা ধরনের বিকৃত তথ্য পরিবেশন করত। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া আসার পরে ওই দেশবিরোধী ক্ষতিকারক নেক্সাসের খবরের ওপর একচেটিয়া অধিকারের অবসান হয়েছে। এখন সংবাদপত্র কোনো খবর প্রকাশ না করলেও মানুষ সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ঠিক খবরটি জানতে পারেন। ফলে অনেক সময় সংবাদমাধ্যমও বাধ্য হয় সত্যি খবরটি প্রকাশ করতে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আমাদের রাজ্যের ৯০ শতাংশ প্রিন্ট ও টেলিভিশন মিডিয়াই বিজ্ঞাপন পাওয়ার জন্য এবং অন্যান্য আর্থিক কারণে বর্তমান রাজ্য সরকারের অঙ্গুলি হেলনে চলে। তাই এখানে ধুলাগড়, চন্দননগর-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় যখন হিন্দুদের ওপর জেহাদি আক্রমণ চলে তা মূলধারার সংবাদমাধ্যম চেপে গেলেও সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে যখন এই ঘটনাগুলির নানা ভিডিয়ো মানুষের কাছে চলে আসে তখন মানুষ একদিকে যেমন সত্য ঘটনাটি জানতে পারে, তেমনি সংবাদমাধ্যমগুলিও বাধ্য হয় এই খবরগুলি কভার করতে। অন্যদিকে সিএএ ও নূপুর শর্মার বক্তব্যে প্রতিক্রিয়াশীল রাজ্যের জেহাদিরা যখন কয়েকশো কোটির সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করার পাশাপাশি হিন্দু সম্পত্তিও ধ্বংস করে তখনও সেই খবর সোশ্যাল মিডিয়ার সূত্রে মানুষের সামনে আসে। ২০২১ সালের ২ মে ভোটের ফল বেরোবার পরও গোটা রাজ্যে বিরোধী কর্মীসমর্থকদের ওপর যে বর্বরোচিত আক্রমণ নেমে আসে তাও সোশ্যাল মিডিয়ার জন্যই সাধারণ মানুষ জানতে পারে।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের মধ্যে একটা কংগ্রেসপন্থী ও বিজেপি-বিরোধী মানসিকতা দেখা যায়। যা আগে সোশ্যাল মিডিয়ার অভাবে খুব একটা কাউন্টার করা সম্ভব হতো না। ফলে মানুষ সত্যিটাও ঠিকঠাক জানতে পারতেন না। তাই ২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গার পর বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম সত্যিটা তুলে না ধরে বিজেপি ও মোদী-বিরোধী নানা মিথ্যা ও অর্ধসত্য খবর প্রচার করে। সে যুগে সোশ্যাল মিডিয়ার অভাবে মানুষের কাছে গোধরার ট্রেন জ্বালানোর ভয়াবহতা সমেত অন্যান্য ঘটনা ঠিকমতো পৌঁছানো যায়নি। বাজপেয়ীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের নানা উন্নয়নমূলক কাজের খবরও মানুষের কাছে ঠিকঠাকমতো পৌঁছায়নি। যার ফলশ্রুতি ছিল ২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির হার। কিন্তু বর্তমানে ২০১৪ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে যে 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া'র সূচনা হয়েছে তাতে সব সত্য খবর সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। এতে মানুষ নিজেরাই বুঝতে পারে কোনটা সত্যি আর কোনটা নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বিংশ শতকে ভারতবর্ষ ছাড়াও এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশই স্বাধীনতা পেয়েছিল। কিন্তু ভারতবর্ষই তৃতীয় বিশ্বের একমাত্র দেশ যেখানে স্বাধীনতার পর থেকে দেশে কখনও সামরিক শাসন জারি হয়নি। জরুরি অবস্থার কালো দিনগুলিকে বাদ দিলে ভারতবর্ষ পৃথিবীর বৃহৎতম গণতন্ত্র হওয়ার পাশাপাশি একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক গণতন্ত্র হিসেবেও নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। স্বাধীনতার পর প্রায় কয়েক দশক ধরে দেশে বহু মানুষ শিক্ষার বাইরে থাকলেও দারিদ্র্যসীমার নীচে থেকেও ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের মহিমা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এ এক বিরল ঘটনা। আর বর্তমান ভারতবর্ষে মূলধারার সংবাদমাধ্যমের একটি বড়ো অংশের ন্যক্কারজনক ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও ডিজিটাল মিডিয়া সাধারণ মানুষকে সহায়তা করে চলেছে সাদাকে সাদা আর কালোকে কালো বলতে। যা পক্ষান্তরে ভারতীয় গণতন্ত্রকেই আরও শক্তিশালী করে চলেছে।

(লেখক ইতিহাসের অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিক)

ফ ঃ ৫

ভারতে গণতন্ত্র রক্ষায় গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ভূমিকা

বিমলশঙ্কর নন্দ

গণতন্ত্রের অর্থ নিয়ে প্রশ্ন করলে স্বাভাবিকভাবেই যে সংক্ষিপ্ত উত্তরটা আসে তা হলো জনগণের শাসন। আব্রাহাম লিংকনের অতি পরিচিত সংজ্ঞাও গণতন্ত্রের আলোচনায় বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়— 'জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা, জনগণের শাসন'। গণতন্ত্র জনগণের শাসন এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে আরও বহু বিষয় যুক্ত হয়ে যায়। গণতন্ত্র দীর্ঘস্থায়ী হয় যদি দেশে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি থাকে, এমন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হয় যা গণতন্ত্রকে রক্ষা করে, তার শিকড়কে সমাজের অনেক গভীরে প্রোথিত করে। তাই গণতন্ত্রকে কেবল শাসন ব্যবস্থার ধরন হিসেবে ভাবলে চলবে না। এক গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলা জরুরি। বিশিষ্ট রাজনীতি বিজ্ঞানী গিডিংস তাই বলেছেন, 'গণতন্ত্র সরকারের একটি রূপ হতে পারে, রাষ্ট্রের একটি ধরন হতে পারে, সমাজের একটি রূপ হতে পারে, কিংবা এই তিনটির একটি সমন্বিত রূপ হতে পারে।' সমাজে যদি গণতন্ত্র না থাকে, মানুষের মানসিকতার মধ্যে যদি গণতন্ত্রের উপস্থিতি না থাকে, তবে কৃত্রিমভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। যদি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবও হয় তাকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। হাজার চেষ্টা করেও আফগানিস্তানে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা বা তাকে স্থায়ী করা সম্ভব হয়নি। আদৌ কখনো সম্ভবও নয়। আর হাজার চেষ্টা করেও ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা সম্ভব নয়। আফগান সমাজে কোনো গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি তৈরি হয়নি। আর ভারতের সমাজ ব্যবস্থা আর মূল ধারার সংস্কৃতি মূলত গণতান্ত্রিক। ১৯৭৫-এ জরুরি অবস্থা জারি করে এদেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু দু' বছরের মধ্যেই আবার গণতন্ত্রের পথে ফিরে আসতে হয়েছিল। পরিবারবাদ, আঞ্চলিকতা, দুর্নীতি ভারতীয় গণতন্ত্রকে নিঃসন্দেহে দুর্বল করেছে। কিন্তু এই অগণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিতর থেকেই শুরু হয়েছে। ফলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েনি। বরং তা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে।

প্রাচীন গ্রিক নগররাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, এ নিয়ে রাজনীতির পণ্ডিতরা একমত। কিন্তু গ্রিসের মতো প্রাচীন ভারতেও গণতন্ত্রের ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে গণতান্ত্রিক সংস্থা ও রীতিনীতির অস্তিত্ব ছিল। বৈদিক যুগে 'সভা', 'সমিতি' প্রভৃতি গণতান্ত্রিক সংস্থা বর্তমান ছিল। সাধারণ মানুষের বিশেষ অধিকারও স্বীকৃত হতো। পৌরাণিক ধর্মগ্রন্থগুলিতে এর

উল্লেখ পাওয়া যায়। কৌটিল্য মনে করতেন প্রজার সঙ্গে রাজার সম্পর্ক আসলে একটি চুক্তির সম্পর্ক। প্রজার কর্তব্য হলো রাজাকে কর এবং আনুগত্য প্রদান করা। বিনিময়ে রাজা প্রজাদের দেন নিরাপত্তা। অর্থাৎ রাজা প্রজা উভয়েই কর্তব্যের বন্ধনে আবদ্ধ। এই ভাবনার মধ্যে গণতান্ত্রিক মানসিকতা খুঁজে পাওয়া যায়। ষোড়শ মহাজনপদের আমলে লিচ্ছবি-সহ কয়েকটিতে রীতিমতো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। প্রাচীন ভারতের গ্রামীণ সমাজে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। অর্থাৎ গণতন্ত্র ভারতীয় সভ্যতায় নতুন কিছু নয়। এখানে জোর করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজন হয়নি। ভারতে দীর্ঘদিন ধরে গড়ে উঠেছে এক গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যেসব দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছিল তার অধিকাংশই চলে গেছে স্বৈরাচারের কবলে। কিন্তু গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিই টিকিয়ে রেখেছে ভারতীয় গণতন্ত্রকে।

প্রাচীন যুগ থেকেই ভারতে যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তাতে গণতন্ত্রের উপস্থিতি লক্ষণীয়। ভারতীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতির এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো সমন্বয় ও সহমত। ভারতীয় জনগণের মধ্যে ঐকমত্যে উপনীত হওয়ার এক স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। সকলের স্বার্থে নিজের ভিন্নমতকে বিসর্জন দিয়ে ঐকমত্য গড়ে তোলার ঐতিহ্য অনুসরণ করে সমাজবদ্ধ মানুষেরা। ইতিহাসবিদ কে এম পানিক্করের অভিমত অনুযায়ী, সব সময়ই ভারতের ঐতিহ্য ছিল সমন্বয়মূলক। হিন্দু ও বৌদ্ধ এই দুই মহান ধর্মের মধ্যে উপলব্ধি, সহনশীলতা ও সমন্বয়ের আদর্শের অস্তিত্ব দেখা যায়। এই সমস্ত আদর্শ ভারতীয় সমাজকে গণতান্ত্রিক করে গড়ে তুলেছে। গণতন্ত্রের মূল কথাই হলো অপরকে সহ্য করা, অপরের মতকে গ্রহণযোগ্য হলে তাকে গ্রহণ করা। প্রাচীন যুগ থেকেই ভারতীয় সমাজ গণতন্ত্রের এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। ভারতীয় গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির আর এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো অপ্রয়োজনীয়ভাবে কর্তৃত্বের বিরোধিতা না করে তার সালিশি করার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া। ১৬৫১ সালে প্রকাশিত লেভেয়াথান গ্রন্থে চুক্তিবাদী ব্রিটিশ দার্শনিক টমাস হবস বলেন, মানুষ রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচার জন্য। কারণ রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ না থাকলে মানুষ সকলের বিরুদ্ধে সকলের যুদ্ধে লিপ্ত হবে। তাই রাষ্ট্র ও তার কর্তৃত্বের বিরোধিতা করা যায় না। কর্তৃত্বের গুরুত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কে প্রাচীন ভারতীয় ভাবনা পশ্চিমের চেয়ে আলাদা। এখানে কর্তৃত্বের সালিশিমূলক ভূমিকার ওপর বরাবর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই একবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের যুগেও সমাজের বৃহত্তর অংশ কর্তৃত্বের সালিশিমূলক ভূমিকা গ্রহণ করে। এই মনোভাব ভারতীয় গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছে। এ দেশে বিভিন্ন সমস্যার মীমাংসার ব্যাপারে মানুষ সরকারি বা রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হন। এই প্রবণতা অন্য দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে দেখা যায় না।

গণতন্ত্র রক্ষার্থে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানকে সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব নিতে হয়। তাদের ব্যর্থতা গণতন্ত্রের পক্ষে ভালো বার্তা বহন করে আনে না।

ভারতীয় গণতন্ত্রকে স্থায়ী ও শক্তিশালী করেছে ভারতের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ। প্রাচীন ভারতে সভা কিংবা সমিতির মধ্যে এক প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থার ছোঁয়া পাওয়া যায়। আধুনিক পার্লামেন্ট সেই ঐতিহ্য বহন করে এক শক্তিশালী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। পার্লামেন্ট শাসন বিভাগের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করে। এর ফলে শাসন বিভাগ স্বৈরাচারী হতে পারে না। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা পার্লামেন্টের কার্যপ্রণালীকেও জনগণের সামনে হাজির করে দিয়েছে। তাই পার্লামেন্টে আলোচনার মান উন্নত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। শিক্ষিত এবং কর্মক্ষেত্রে সফল ব্যক্তিরা যত বেশি নির্বাচনী রাজনীতিতে অংশ নেবেন, নির্বাচনে জিতে পার্লামেন্টে প্রবেশ করবেন, ভারতীয় পার্লামেন্টের গুরুত্ব ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতিতে আরও বাড়বে। ভারতীয় গণতন্ত্রের পক্ষে সেটা মঙ্গলজনক হবে। ভারতীয় গণতন্ত্রের সাফল্যের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। প্রাচীন ভারতে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত পঞ্চায়েতের হাতে প্রভূত ক্ষমতা প্রদান করা হতো। ভারতীয় সংবিধানের রচয়িতারা রাষ্ট্রকাঠামোর নীচের স্তরে স্থানীয় সরকারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। তাই সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতিতে স্থানীয় সরকার গঠনের সংস্থান রাখা হয়। সংবিধানের ৪০তম ধারায় বলা হয় 'স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সরকার গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন করবে এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ন্যস্ত করবে। ১৯৯২ সালে সংবিধানের ৭৩ এবং ৭৪তম সংশোধনীর মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এবং শহরাঞ্চলে পুর প্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজনীয়তাকে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। পরবর্তীতে আইন সংশোধনের মাধ্যমে এগুলিকে আরও জনমুখী করা হয়। স্থানীয় প্রশাসনকে জনগণের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে এনে গণতন্ত্রকে আরও দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করার চেষ্টা চালানো হয়।

উপরে যে প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা আলোচনা করা হলো সেগুলি মূলত জনগণের দ্বারা নির্বাচিত। এর বাইরে আরও অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, ভারতীয় গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে যাদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। যেমন বিচারবিভাগ। তবে গণতন্ত্র রক্ষার্থে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানকে সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব নিতে হয়। তাদের ব্যর্থতা গণতন্ত্রের পক্ষে ভালো বার্তা বহন করে আনে না।

(লেখক বিশিষ্ট অধ্যাপক ও গবেষক)

With Best Compliments
from -

SRESTH PRODUCTS PVT. LTD.

Dealing in all kind of edible oil

49, Strand Road,
Kolkata - 700 007

With Best Compliments From -

South Calcutta Diesels Pvt. Ltd.

Sales & Service

225-D, A. J. C. Bose Road, Kolkata - 700 020

Phone : 2302-5250/ 3/ 4, Fax : 033-2281-2509 / 2287-6329,

E-mail : scdtodi@scdtodi.com

Authorised Dealers of

BOSCH LTD. BOSCH, GMBH-GERMANY,

DEUTZ, A. G., GERMANY

LOMBARDINI - ITALY, V. M. MOTORI - ITALY

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সংবাদপত্রের ভূমিকা

সুজিত রায়

১৮৪৩ সাল। কলকাতার বইবাজারের তখন রমরমিয়ে দখল নিয়েছে বটতলার রসালো আদিরসাত্মক বই। বাঙ্গলার ঘরে ঘরে তখন ঠাঁই নিয়েছে 'কেশ রহস্য', 'শৃঙ্গার তিলক', 'স্ত্রীচরিত্র', 'সম্ভোগ রত্নাকর', 'রসমঞ্জরী', আদিরস ইত্যাদি। ফলে বাঙ্গালি সমাজে ভালো মানের সংবাদপত্র সে সময়ে থাকলেও আধা-শিক্ষিত, অশিক্ষিত, হঠাৎ উঠতি 'জমিদার' সম্প্রদায় ও বাবু সমাজের দৃষ্টি থেকে সেইসব সংবাদপত্র ধীরে ধীরে অপসৃত হচ্ছিল। কোনও আইন ছিল না। ফলে ওই সব প্রকাশনা বন্ধও করা যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারই ১৮৫৬ সালে আইন তৈরি করে বন্ধ করে দেয় ওইসব অশ্লীল ভাষা ও ছবির বইগুলি।

এবং এই সময়েই দেখা গেল, রাজা রামমোহন রায় এবং ডিরোজিও প্রভাবিত ইয়ং বেঙ্গল গ্রুপ সাংবাদিকতার জগতে যে ধারা তৈরি করে দিয়েছিলেন, তারই প্রভাবে এসময় বেশ কয়েকটি ভালো মানের ইংরেজি সংবাদপত্র জন্ম নিল। যেমন, কাশীপ্রসাদ ঘোষের Hindu Intelligencier, শ্রীনাথ ঘোষের Bengal Recordes, তারাচাঁদ চক্রবর্তীর Quill ইত্যাদি। পাশাপাশি বাংলা ভাষায় রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' নামক মাসিক পত্রিকার জন্মও হয় এসময়েই। বিবিধার্থ সংগ্রহই ছিল প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

বাঙ্গালি সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীর এই উদ্ভব এসময় বাঙ্গালি চেতনাকে উদ্দীপ্ত করতে শুরু করে। বিশেষ করে শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হতে থাকে সুস্থ চিন্তা এবং স্বাধিকারবোধের ভাবনা। এই ভাবনার উদ্গাতা ছিলেন হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ভারতীয় সাংবাদিকতায় যাঁকে 'সাংবাদিকতার স্বাধীনতা'র জনক হিসেবে সম্মান জানানো হয়। হরিশচন্দ্রই প্রথম তাঁর সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে তাঁর দুর্দম কলমকে ব্যবহার করতে শুরু করেন। সরাসরি ব্রিটিশ বিরোধী এমন দৃঢ় লেখনী এর আগে ভারতীয় সংবাদপত্রের পাতায় চোখে পড়েনি।

Amrita Bazar Patrika

BIRTH OF TWO NEW FREE DOMINIONS

INDIA INDEPENDENCE BILL RECEIVES ROYAL ASSENT

FINAL PARTING OF WAYS TO-DAY

Congress & Muslim League Members In Interim Cabinet To Separate

BEVIN DENIES CHARGE OF CREATING DIVISION

EUROPE MUST PLAY MAJOR ROLE IN WORLD CIVILIZATION

LIGHT ON BRITAIN'S DOMESTIC CRISIS

Nations Have To Move With Great Care And Patience

তাই হিন্দু পেট্রিয়টকেই 'ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র'-এর মর্যাদা দেওয়া হয়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন হিন্দু পেট্রিয়ট প্রকাশের কিছুদিন আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল অত্যন্ত ভালো মানের ইংরেজি সংবাদপত্র 'Bengal Recorder'। সমাজে তখন একটি ভালো ইংরেজি সংবাদপত্রের প্রয়োজনও ছিল যথেষ্ট। কারণ সেই অর্থে 'সাহসী' সংবাদপত্রের তখন অভাব অনুভূত হচ্ছিল। সেই অভাব বা ঘাটতি পূরণের জন্যই জন্ম নিয়েছিল 'হিন্দু পেট্রিয়ট'।

ভারতীয় সমাজে ততদিনে রাজনৈতিক উত্থান-পতনের এক নবযুগের সূচনা হয়েছে। ১৮৩৩-এ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তখন রাজকীয় সনদের বলে ভারতে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার পেয়েছে। পেয়েছে এদেশে সম্পত্তি কেনা এবং নীলচাষের অধিকার। সেই অধিকারের সুযোগ নিয়ে অত্যাচারী ইংরেজ ব্যবসায়ীরা গরিব ভারতীয় চাষিদের দাদন নিতে বাধ্য করতে শুরু করেছে— যে দাদনের কাছে কালক্রমে বিকিয়ে যেতে থাকে চাষিদের মাথা, বংশানুক্রমে। গরিব চাষিদের বাধ্য করা হয় অন্য চাষ বন্ধ করে নীলচাষ করতে। এবং সেই নীল অত্যন্ত কম দামে চাষিদের বাধ্য করা হতো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বিক্রি করে দিতে। ফলে চরম দারিদ্র্যের শিকার হয় গরিব চাষিরা। ভারতের অর্থনীতি ভেঙে পড়তে থাকে। শুধু আঙুল ফুলে কলাগাছ হতে থাকে নীলকুঠির ব্রিটিশ মালিকদের।

বছরের পর বছর এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছিল। বিশেষ করে বাঙ্গলার গ্রামে গ্রামে। ১৮৫৯ সালে তা বিদ্রোহে পরিণত হয়। ব্রিটিশ বিরোধী সেই বিদ্রোহই ছিল পরবর্তীকালে স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি। নীল বিদ্রোহের সেই জন্মলগ্নেই আবির্ভাব ঘটে হিন্দু পেট্রিয়ট এবং হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের।

হিন্দু পেট্রিয়টের পাতায় পাতায় দিনের পর দিন ফুটে ওঠে নীলকুঠির ব্রিটিশ মালিকদের অত্যাচারের কাহিনি, গরিবগুর্বো চাষিদের অশেষ যন্ত্রণা ও আত্মহত্যার মর্মান্তিক কাহিনিগুলি। হিন্দু পেট্রিয়টের অনুপ্রেরণায় নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র লেখেন 'নীলদর্পণ' নাটক যা পরবর্তীকালে Indigo Mirror নামে অনুবাদ করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তরুণ সাংবাদিক শিশিরকুমার ঘোষ গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কাহিনি সংগ্রহ করে তা বলিষ্ঠ ভাষায় পাঠাতে থাকেন হিন্দু পেট্রিয়টে। আর সেই সব খবর প্রভাব ছড়িয়ে দেয় শিক্ষিত শহুরে সমাজ তথা গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের মধ্যেও।

একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, নীলবিদ্রোহের ভিত্তিভূমি তৈরি করে দিয়েছিল হিন্দু পেট্রিয়টই। তবে একথা অনস্বীকার্য, জাতীয়তাবোধ উন্মেষের প্রথমার্ধে হিন্দু পেট্রিয়টই সংবাদপত্রের মাধ্যমে স্বাধিকার বোধে উদ্দীপ্ত করেছিল গোটা ভারতবাসীকে।

বিশিষ্ট সাংবাদিক জি পরমেশ্বর তাই হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'The first native journalist of any note in India'! বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক মোহিত মৈত্র তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন— 'He (Hurish Chunder) always fights for truth and justice. No power can either bend or break him. The editorial comments of the 'Patriot' show the fearless stand of an honest editor in the midst of dangerous situation.'

আর Bengal Recorder-এর প্রতিষ্ঠাতা গিরীশচন্দ্র ঘোষ তাই হিন্দু পেট্রিয়ট এবং হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে বলেছেন— 'A thunderbolt has fallen upon native society, Hushed its every voice and fixed is every eye. The fried of the poor and the mentor of the rich, the spokesperson, the 'Patriot', the brave heart that defied danger and battled the strife of policies, has been swept away like a vision from our aching eyes...our loss is great.

হরিশচন্দ্র তখনও বেঁচে। ১৮৫৭-য় ভারতবর্ষের বুকে ঘটে গেল আর এক ইতিহাস— মহাবিদ্রোহ বা মহাসংগ্রাম। আর হরিশচন্দ্রই প্রথম এই মহাসংগ্রামকে 'The Great Indian Revolt' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। এই মহাসংগ্রাম সম্পর্কে অধিকাংশ সংবাদপত্র যখন তৎকালীন প্রচলিত জনমতের উর্ধ্বে উঠতে পারেনি, হিন্দু পেট্রিয়ট সেখানে ছিল ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত, যেখানে হরিশচন্দ্র লিখেছিলেন— 'History will we conceive, take a very different view of the facts or the great Indian Revolt of 1857 from what contemporaries have taken of them...The nation has been raised and thoroughly prepared for revolution.' বিশিষ্ট সাংবাদিক- সম্পাদক ও লেখক ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন— (মহাবিদ্রোহের পর) বাঙালির স্বেচ্ছার্জিত স্বাধিকার চিন্তা আপন বিবর্তনের পথ ধরে ক্রমপরিণতি লাভ করেছে এবং রাষ্ট্রচিন্তার ক্রমানুসারী হয়েছে।

সেই বিবর্তনটা কেমন?

১৮৫৭-য় মহাসংগ্রামের পরই ১৮৫৮-য় জন্ম নিল সোমপ্রকাশ পত্রিকা--- বাংলা সাংবাদিকতার ইতিহাসে এক নতুন চেতনার জন্মদাতা। তারপর ১৮৬৮-তে এল শিশিরকুমার ঘোষের বাংলা সাপ্তাহিক অমৃতবাজার পত্রিকা। এই সমস্ত কাগজগুলিরই লক্ষ্য ছিল, শুধু আবেগসর্বস্ব হয়ে ব্রিটিশ বিরোধিতা নয়, স্বাধীনতার দাবিতে গোটা দেশকে উদ্‌বুদ্ধ করা। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার যুদ্ধে সংবাদপত্র, রাজনৈতিক দল এবং বিভিন্ন সামাজিক সমিতির ভূমিকা একাকার হয়ে গিয়েছিল। ঘর আর উঠোন এক করে দেওয়া সেদিনের আন্দোলনসমূহের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। যেখানে বাঙ্গলার নবজাগরণ আন্দোলন বিশাল ভূমিকা পালন করেছিল। এবং সেই আন্দোলনের পথ ধরেই এল বিংশ শতক— নতুন আশা, নতুন স্বপ্ন নিয়ে— ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতে হবে। আর এই উদ্যোগের মাধ্যম হলো 'বঙ্গবাসী', বালগঙ্গাধর তিলকের 'কেশরী', সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দি বেঙ্গলী'-সহ নানা পত্রপত্রিকা যেখানে ফুলে ফলে বিকশিত হতো দেশের স্বাধীনতার দাবিদাওয়া আর স্বপ্নের কথা। তবে সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে সংবাদপত্রের মাধ্যমে ব্রিটিশ শক্তিকে হারিয়ে ভারতের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়ার তেতনাকে ছড়ালেন ঋষি অরবিন্দ ঘোষ তাঁর বন্দেমাতরম্ পত্রিকার মাধ্যমে ১৯০৫ সালে। তিনি লিখলেন— 'The only progress that has to be made in the preparation for liberty is progress in the awakening of the national spirit।' তিনিই প্রথম গলা উচিয়ে লিখলেন— আমরা ব্রিটিশ কবল থেকে মুক্ত, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা (স্বরাজ) চাই।

'বন্দেমাতরম্'-এর সমসাময়িক পত্রিকা ছিল যুগান্তর। যুগান্তর ছিল সরাসরি অনুশীলনি সমিতির পদানুসারী। স্বামী বিবেকানন্দের ছোটো ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন যুগান্তরের দ্বিতীয় সম্পাদক। উগ্র বিপ্লববাদের সমর্থক যুগান্তর ছিল বন্দেমাতরম্ পত্রিকার মতোই ব্রিটিশ শাসকের চোখে রাজদ্রোহী। রাজদ্রোহিতার অভিযোগে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত স্পষ্ট ভাষায় বিচারককে বলেছিলেন— 'দুঃখিনী জন্মভূমির জন্য যা কর্তব্য বুঝেছি করেছি, আপনার যা ইচ্ছে হয়, তাই করুন'। একই সময়ে ১৮৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের দৈনিক বসুমতীও সেসময় জাতীয়তাবোধের প্লাবন ছড়িয়ে দিয়েছিল গোটা দেশে বিশেষ করে তরুণ সমাজের মধ্যে। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল 'নবশক্তি', 'ইন্ডিয়ান মিরর', 'সঞ্জীবনী' 'ধর্মবন্ধু', 'দাসী', 'প্রদীপ', 'মডার্ন রিভিউ', 'হিতবাদী', 'দ্য হিন্দু', 'ইন্দুপ্রকাশ', 'মারাঠা' ইত্যাদি 'বাংলা ও অন্যান্য ভাষার পত্রিকাসমূহ। এ পর্যন্ত সবটুকুই ছিল ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লববাদের সমর্থনে সংবাদপত্র মহলের সঙ্গত।

কিন্তু সেই ভূমিকাই আরও সংগঠিত পর্যায়ে রূপ নিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আন্দোলন জোরালো রূপ নেওয়ার পর। গবেষকমাত্রেই স্বীকার করেন যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের দুটি ধারা— অহিংস আন্দোলন এবং বিপ্লববাদ— দুটিরই আঁতুড়ঘর ছিল বঙ্গদেশ। এবং তীব্র স্বাদেশিকতাকে ভাবাবেগে পরিণত করতে সে যুগের বাংলা সংবাদপত্রগুলিই মূল ভূমিকা নিয়েছিল। তবে একথাও মেনে নিতে দ্বিধা করা যায় না যে— বাঙ্গলার পাশাপাশি মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব, গুজরাট, মাদ্রাজ এমনকী বিহারের মতো রাজ্যও সংবাদপত্রের মাধ্যমে স্বদেশি আন্দোলনের প্রভাব ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

নিয়েছিল। সেই ভূমিকার ক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রগণ্য ভূমিকাটি ছিল Young India পত্রিকার যার সম্পাদক ছিলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী বা মহাত্মা গান্ধী। ১৯২১-এ প্রকাশিত Young India-র ১৯২৫-এর ২ জুলাই সংখ্যায় মহাত্মা গান্ধী লিখেছেন : 'I have taken up journalism not for its sake but merely as an aid to what I have conceived to be my mission of life.' আর সেই নিশানটা ছিল অহিংস আন্দোলনের প্রচার দেশের দিক্‌বিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া। অবশ্য তার জন্য মিথ্যার আশ্রয় যে তিনি নেবেন না সেকথাও লিখেছিলেন— 'the national cause will never suffer by honest criticism of national institution and national policies.'

বাঙ্গলায় নতুন মাইলফলক হিসেবে ১৯২২ সালে এল আনন্দবাজার প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দাবি তুলে। প্রথম প্রকাশের পাঁচ দিনের মাথাতেই মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত আনন্দবাজারের সম্পাদকীয়তে লেখা হলো— 'স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার আর উহা আমাদের লাভ করিতেই হইবে, নতুবা আমাদের জাতির থাকা না-থাকা সমান।' অতএব আনন্দবাজারও হয়ে গেল রাজদ্রোহী। শাস্তি ১৯ বার জেল ও জরিমানা। আনন্দবাজার গোষ্ঠীরই প্রকাশন 'দেশ' পত্রিকার ভূমিকাও ছিল অসামান্য।

স্বাধীনতা সংগ্রামে সংবাদপত্রের ভূমিকা প্রসঙ্গে বলতে গেলে উল্লেখ করতেই হয় দাদাঠাকুর নামে সমধিক পরিচিত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ও তাঁর সম্পাদিত বিদূষক পত্রিকার। ব্যঙ্গ ও শ্লেষের মাধ্যমে তাঁর প্রতিবাদী ভূমিকা ছিল তরবারির মতো ধারালো। তবে পরিচয় দিতে গিয়ে দাদাঠাকুর নিজেই বলতে ভালোবাসতেন— 'জংলি কাগজের জংলি এডিটর।' তাঁর সম্পাদিত আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা— জঙ্গীপুর সংবাদ। এই পত্রিকায় দাদাঠাকুর ১৯২৯ সালে লিখেছিলেন, 'অন্যান্য দেশের লোক এ দেশে আসিয়া নবাবের মতো বাস করিবে।

অর্থাৎ সম্পদ অর্জন করিবে, যেমন ইচ্ছা বুক ফুলাইয়া চলিবে অথচ এ দেশবাসী অপর কোনো দেশে গিয়া সামান্য নাগরিকের অধিকারও পাইবে না। ইহা লইয়া এদেশবাসীকে বারবার চরম লজ্জাকর আবেদন নিবেদন করিতে হইবে ও বারবার কুকুর বিড়ালের মতো প্রত্যাখ্যাত হইতে হইবে। ...চোখের উপর এইসব দেখিয়া শুনিয়াও দেশবাসী চুপ করিয়া থাকে। জাতির ক্লেশ ও মোহ ইহাদের জড়তা ভাঙিয়া এইসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাহস দেয় নাই। তাই অন্যায় দেশবাসীর ঘাড়ে ক্রমশ আরও জাঁকিয়ে বসিতেছে।' তাঁর লেখা অন্যতম সম্পাদকীয় স্বাধীনতার স্বাদহীনতা--- আজও বলিষ্ঠ সম্পাদকীয়র নমুনা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদনা করতেন 'ধূমকেতু' পত্রিকা। তীব্র জাতীয়তাবোধের উন্মাদনা সৃষ্টিতে দক্ষ কারিগর নজরুলের সোজা কথা ছিল--- 'ধূমকেতু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়— স্বরাজটরাজ বুঝি না— ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীন থাকবে না।' কারাবাস হয়েছিল। কিন্তু পিছিয়ে আসেননি অগ্নিবীণার কবি 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার' পার করা কবি সম্পাদক নজরুল।

সাধারণ সচেতন মানুষ, বুদ্ধিজীবী লেখক কবিদের পাশাপাশি স্বাধীনতা সংগ্রামে সংবাদপত্রের মাধ্যমে যোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন কিছু শিল্পপতিও। যেমন ঘনশ্যাম দাস বিড়লার 'হিন্দুস্তান টাইমস', গান্ধীজীর আন্দোলনের জোরালো সমর্থক রামনাথ গোয়েঙ্কার 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' ও 'ভারত'। ব্রিটিশের দমননীতির চাপে ১৯৪৩ সালের ২০ আগস্ট ভারত যেদিন বনধ্ হয়ে যায়, সেদিনও সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল— 'আজ দেশের সংগ্রাম শুরু হইয়াছে। গভর্নমেন্ট জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহের কণ্ঠরোধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বর্তমান বিধি নিষেধের গণ্ডি মানিয়া চলিলে সংবাদপত্রকে কর্তব্যভ্রষ্ট হইতে হয়। এ গ্লানি অসহ্য। হয়তো এই আমাদের শেষ আত্মপ্রকাশ— এই সাময়িক আত্মবিলোপের পরও যদি আত্মপ্রকাশের সুযোগ আমরা পাই, তবে জনগণের নিকট এই স্নেহের দাবি তখনও করিব।...'

স্বাধীনতা সংগ্রাম যত তীব্র হয়েছে, মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যত গভীর হয়েছে, ততই চাহিদা বেড়েছে সংবাদপত্রের।' ৩০ ও ৪০-এর দশকে এই চাহিদার ফলেই বাঙ্গলায় জন্ম নেয়--- 'নবযুগ', 'প্রত্যয়', 'পশ্চিমবঙ্গ', 'স্বরাজ', 'মাতৃভূমি', 'কৃষক', 'হিন্দুস্তান', 'পলাশী', 'কিশোর', 'ইত্তেফাক', 'সত্যযুগ'। ইংরেজিতে 'জয় হিন্দ', 'ইস্টার্ন এক্সপ্রেস', 'স্টার অব ইন্ডিয়া', 'মর্নিং নিউজ', 'ফ্রিল্যান্স', 'দ্য ন্যাশনালিস্ট'।

প্রকাশিত হয় কানপুরের হিন্দি পত্রিকা 'সাম্যবাদী', আব্দুর রেজ্জাক মালিহাবাদীর উর্দু দৈনিক 'রোজানা হিন্দ', কলকাতার উর্দু পত্রিকা 'মুসাবৎ', চেন্নাইয়ের ইংরোজি পত্রিকা 'ভ্যামগার্ড', মুম্বাইয়ের ইংরেজি পত্রিকা 'দ্য সোশ্যালিস্ট', পঞ্জাবী গুরুমুখী ভাষায় প্রকাশিত 'কীর্তিকিষাণ', ঢাকার বাংলা কাগজ 'বাংলার বাণী' ইত্যাদি।

জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের দোসর সংবাদপত্রগুলির জনপ্রিয়তা সেসময় আকাশ ছুঁয়েছিল এবং সম্ভবত যে কারণেই আর্থিক সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে এসেছিল বহু ব্যাংক--- ইউনাইটেড ব্যাংক লিমিটেড, কমার্শিয়াল ব্যাংক, ভারতী ব্যাংক, নাথ ব্যাংক, সেন্ট্রাল ব্যাংক ইত্যাদি। একটা সময়ে দেখা গেল— সংবাদপত্র বা পত্রিকা জন্ম নিচ্ছে শুধুমাত্র ব্রিটিশ বিরোধিতার মুখ হয়ে উঠতেই। ভারতবর্ষের সংবাদপত্র ও পত্রিকার ইতিহাসে এটাই ছিল অনন্য দৃষ্টান্ত। সম্ভবত পৃথিবীর আর কোনো দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সেই দেশের সংবাদপত্রগুলি এই ভূমিকা পালন করেনি।

১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট অবশেষে সত্যি সত্যিই ভারত স্বাধীন হলো। সেই স্বাধীনতার সম্মান ও সম্ভ্রমের আকার হয়েই স্বাধীন ভারতবর্ষে এক নতুন যুগের সাক্ষী হিসেবে প্রতীয়মান ভারতীয় সংবাদপত্রও পা রাখল এক নতুন ভারতবর্ষে— দ্বিখণ্ডিত ভারতবর্ষে যা কখনও কোনও সংবাদপত্রেরই কাঙ্ক্ষিত ছিল না। দীর্ঘ ১৬৬ বছরের ঘাত-প্রতিঘাত, অপমান, লাঞ্ছনার শিকার হয়েও যে সংবাদপত্রগুলি নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল এক নতুন বিশ্বাস, নতুন আকাঙ্ক্ষাকে বুকে ধরে রেখে, তাদের সামনে তখন এক নতুন স্বপ্ন, নতুন চ্যালেঞ্জ। নতুন যুগের ভোরে কি সে স্বপ্ন সফল হলো? সে, আর এক পর্বের কাহিনি।

সহায়ক গ্রন্থ : *ভারতীয় সাংবাদিকতার বিবর্তন ও প্রভাব---সুজিত রায়, দে পাবলিকেশনস্।*

(লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক ও গবেষক)

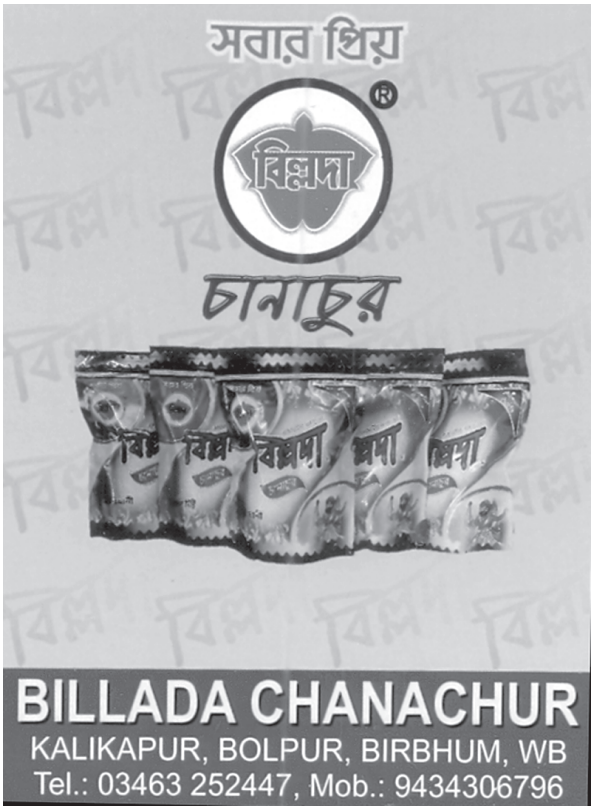

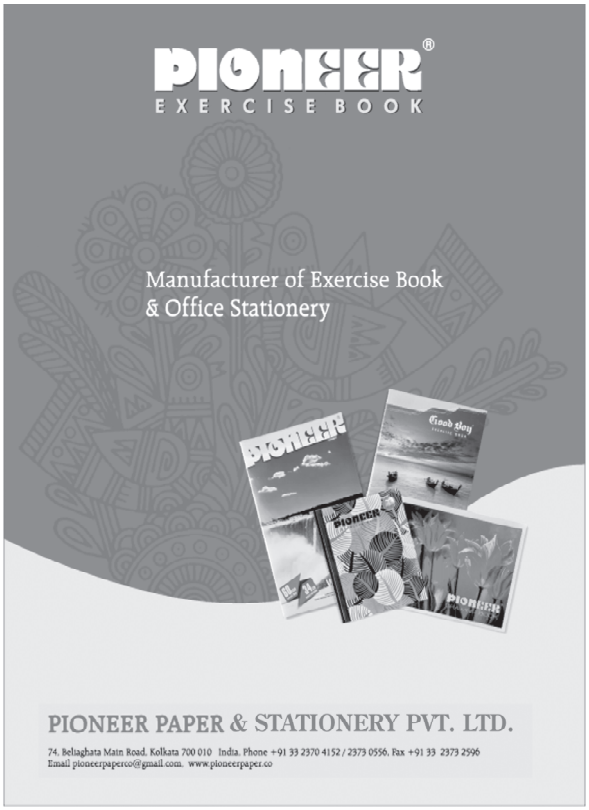

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

বিচারব্যবস্থায় অস্বচ্ছতা সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক

ধর্মানন্দ দেব

বিশ্বের প্রাচীনতম গণতন্ত্রের জন্মদাত্রী ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের মূল তিনটি স্তম্ভ হচ্ছে যথাক্রমে— আইনসভা, বিচারসভা ও শাসনব্যবস্থা। আর বিচারসভার ক্ষমতার বুনিয়াদ হচ্ছে সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিচারব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। বিচার- ব্যবস্থার অস্বচ্ছতা আজ নতুন নয়। সঠিক তারিখ এই মুহূর্তে বলতে না পারলেও ১৯৯০ সালে দেশের প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেল কে. কে. বেণুগোপাল একটি ইঙ্গিতবাহী কথা বলেছিলেন— 'ওটা হচ্ছে চীনে বাঁদর... না দেখা যায়, না শোনা যায়, না বলা যায়।'

বিচারব্যবস্থায় বিচারপতিদের নিয়োগ পদ্ধতি নিয়ে স্পষ্ট ভাবে বিশদ কিছু বলা নেই আমাদের দেশের সংবিধানে। স্বাধীনতার পর থেকে সংবিধানের ১২৪ (২) এবং ২১৭ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগ ও বদলি করেন দেশের রাষ্ট্রপতি। সংবিধানের ২২২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি ওই বিষয়ে আলোচনা/ পরামর্শ করতে পারেন সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে, আর হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপাল ও হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে। দেশের রাষ্ট্রপতির এই আলোচনা সংবিধান মোতাবেক বাধ্যতামূলক হলেও বিচারপতি নিয়োগের শেষ কথা বলতেন দেশের রাষ্ট্রপতি।

১৯৮২ সালের এস.পি.গুপ্তা মামলায় (S.P. Gupta and Others Vs Union of India) সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পি.এন. ভগবতীর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ রায়দান করতে গিয়ে সেই কথাই বলেন। এই রায়ে স্পষ্ট

বলা আছে বিচারপতি নিয়োগে রাষ্ট্রপতিই শেষ কথা বলবেন। রায়ে আরও বলা হয় যে সংবিধানে উল্লেখ থাকা রাষ্ট্রপতির আলোচনার কথা যেন বাস্তবে রূপ নেয়। কিন্তু দেশের শীর্ষ আদালত ৬ অক্টোবর ১৯৯৩ সালে আরও একটি মামলায় যার নম্বর Writ Petition (civil) 1303 of 1987 (Advocate on Records -Vs- Union of India) বিচারপতি জে.এস. ভার্মার নেতৃত্বাধীন সাংবিধানিক বেঞ্চ বলেন যে বিচারপতি নিয়োগের শেষ কথা বলবে সুপ্রিমকোর্ট। সুপ্রিমকোর্ট আরও বলে যে একজিকিউটিভরা যখন বিচারপতি নিয়োগে শেষ কথা বলেন, তাদের শক্তির উৎস যে সংসদ, সেই সংসদ সদস্যের কোনও বক্তব্য থাকে না বিচারপতি নিয়োগে।

তাই বিচারপতি নিয়োগের ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের হাতে থাকাই শ্রেয় কারণ তার পেশাদারি জ্ঞান দিয়ে সুপ্রিম কোর্টই বুঝবে কোন ব্যক্তি বিচারপতির আসনে বসার যোগ্য। পরে সুপ্রিমকোর্ট বিচারপতি নিয়োগের জন্য পাঁচ সদস্যের একটি কলেজিয়াম গঠন করে। এই পাঁচ সদস্যের মধ্যে থাকবেন সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং প্রথম সারির চার জন বিচারপতি। আর বর্তমানে এই কলেজিয়াম পদ্ধতি মারফত নিয়োগ করা হয় সুপ্রিমকোর্ট ও দেশের বিভিন্ন হাইকোর্টের বিচারপতিদের। তবুও প্রশ্ন জাগে মনে যে ভারতের বিচার ব্যবস্থা এবং বিচারপতি নিয়োগ ব্যবস্থা কি সম্পূর্ণ স্বচ্ছ? স্বজন পোষণ, দুর্নীতি ইত্যাদি নেই তো? সাধারণ নাগরিক সব ক্ষেত্রেই আদালতের সুবিচারের ব্যাপারে একশতভাগ নিশ্চিত কি? এক কথায় উত্তর দিয়ে বলা যায় না। কারণ বিচারবিভাগের বিভিন্ন স্তরে জমে থাকা পাহাড় প্রমাণ মামলা। বিলম্বিত বিচারের অর্থ যদি হয় বিচার-বঞ্চনা তাহলে দেশের কত লক্ষ মানুষ আজ বিচার বঞ্চিত? এই বিশাল অবিচারের দায় কার? সুপ্রিমকোর্টকে কেন কেন্দ্রের প্রতি কলেজিয়াম নিয়ে কড়া মনোভাব দেখাতে হচ্ছে? বিলম্বিত বিচার ন্যায়বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সবচাইতে বড়ো অন্তরায়। প্রায় ৯ দশক আগেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার 'প্রশ্ন' কবিতায় লিখেছিলেন— 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে'। এই কথা থেকেই প্রমাণ মেলে বিচার নিয়ে অনিয়ম তখনো ছিল, এখনো আছে।

১৯৫২ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত দেশের শাসন ক্ষমতায় ছিল কংগ্রেস দল। আর বিচারবিভাগ ছিল তাদেরই নিয়ন্ত্রণে। আর ১৯৫০ সালে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হন এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি শিবপ্রসাদ সিনহা। তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে দেওয়া হয়। শান্তিভূষণের এক পিটিশনে সুপ্রিমকোর্টে স্পষ্ট জানিয়ে বলা হয় এইরূপ— 'The Federal Court had in 1949 got Justice Shiv Prasad Sinha removed from the Allahabad High Court, merely on the finding that he had passed 2 judicial orders on extra judicial considerations.' ১৯৯৫ সালে বই প্রকাশের জন্য ৭০ লক্ষ টাকা

ফঃ ৬

With Best

Compliments
From

Punjab Glass Depot

With Best compliments from -

A Well Wisher

With Best Compliments From :-

Hommage Commercial Private Limited

M. E. M. INDUSTRIES

AN ISO 9001 : 2015 Company

e-mail : cables@memindustries.com
Poddar Court, Gate no. 4, 2nd floor,
18, Rabindra Sanani,
Kolkata-700 001,
Phone : 22357998, 22352996,
Mob. : 9830120020

OUR RANGE

- Compensating Cables
- High Temperature Cables
- Instrumentation Cables
- Trailing Rubber Cables
- Control & Frls Cables
- Thermocouples & RTD

Also Sole Distributor BELDEN (USA)Cables.

নেওয়ার অভিযোগে পদত্যাগ করেন মুম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি আনন্দময় ভট্টাচার্য। ঠিক পরের বছর 'ফেরা' আইন ভঙ্গের জন্য জেলে যান কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অজিত সেনগুপ্ত। এমন অভিযোগও শোনা যায় সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি এ.এম আহমদির বিরুদ্ধে, যার মেয়ে নাকি বিশেষ সুবিধা পেতেন সুপ্রিম কোর্টের সব এজলাসে। বিচারপতির আত্মীয়রা যাতে সেই আদালতে প্র্যাকটিস করতে না পারেন তখন সেই দাবিও উঠেছিল। ফের ২০০০ সালে অভিযুক্ত হন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এ.এস. আনন্দ। তিনি তাঁর স্ত্রী ও শাশুড়িকে নিম্ন আদালত থেকে তাদের পক্ষে আদেশ পাইয়ে দেন এবং বয়স নিয়েও বিতর্ক শোনা যায়। ২০১১ সালে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌমিত্র সেন দুর্নীতির দায়ে ইম্পিচমেন্ট হয়ে পদত্যাগ করেন। রাজস্থান হাইকোর্টের বিচারপতি অরুণ মদনের বিরুদ্ধে মহিলা সংক্রান্ত অভিযোগ উঠার পর পদত্যাগ করেন।

২০০৩ সালে দিল্লি হাইকোর্টের সুমিত মুখার্জি পদত্যাগ করেন মামলা চলাকালীন তাঁর আদেশ হাইকোর্টের বাইরে বেরিয়ে পড়ার জন্য। অভিযোগ, প্রমোটারদের সঙ্গে নাকি তার যোগাযোগ আছে। পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের বিচারপতি নির্মল যাদবের বিরুদ্ধে সরাসরি ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। ২০১৮ সালের ১২ জানুয়ারি সাংবাদিক সম্মেলন করে খোদ সুপ্রিম কোর্টেই প্রাক্তন মুখ্যবিচারপতি রঞ্জন গগৈ-সহ আরও তিন প্রবীণ বিচারপতি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। দুর্নীতির তালিকা বেশ দীর্ঘ। ২০১৩ সালে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল গ্লোবাল কোরাপশন ব্যারোমিটার এক রিপোর্ট প্রকাশ করে জানিয়েছে ৪৫ শতাংশ ভারতবাসী মনে করে বিচারব্যবস্থায় রয়েছে দুর্নীতি। প্রাক্তন মুখ্যবিচারপতি বেঙ্কটারামাইয়া সাংবাদিক কুলদীপ নায়ারকে বলেছিলেন— 'the judiciary in India has deteriorated in its standards because such Judges are appointed as are willing to be influenced by lavish parties and whisky bottles.' ২০২১ সালে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে জানান গত ৫ বছরে অর্থাৎ ১.১.২০১৭ সাল পর্যন্ত সুপ্রিমকোর্টের মুখ্যবিচারপতি ও হাইকোর্টের মুখ্য বিচারপতির বিরুদ্ধে প্রায় ১,৬৩১টি অভিযোগ পেয়েছে কেন্দ্র। আরও হরেকরকম অভিযোগ বিভিন্ন সময় শোনা যায়, যেমন কলেজিয়ামের সদস্য বিচারপতিদের সঙ্গে সুসম্পর্কই নাকি বিচারপতি নিয়োগের প্রধান যোগ্যতা হয়ে ওঠে। এইসব অভিযোগ থেকে বাঁচতে হলে বা রুখতে হলে বিচার ব্যবস্থার শীঘ্রই সংস্কার জরুরি।

দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ রুখতেই কেন্দ্রের বিজেপি সরকার নীতিগতভাবে বিচারবিভাগীয় নিয়োগ কমিশন গঠনের পক্ষে। তাই বিলম্ব না করে ২০১৪ সালের ১১ আগস্ট লোকসভায় পেশ করে জাতীয় বিচারবিভাগীয় নিয়োগ কমিশন বিল, ২০১৪। ১৩ আগস্ট লোকসভায় ধ্বনিভোটে এবং ১৪ আগস্ট রাজ্যসভায় বিলটি পাশ হয়। ২০১৫ সালের অক্টোবর মাসে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির স্বাক্ষর প্রদানের মাধ্যমে বিলটি আইনে পরিণত হয়। কিন্তু পরে সুপ্রিমকোর্ট এই বিলকে 'অসাংবিধানিক' বলে খারিজ করে দেয়। সেই সময়ের আইনমন্ত্রী বলেছিলেন— 'এটা অনির্বাচিতদের কর্তৃত্ববাদিতা'। তবুও কেন্দ্র সরকার এই রায়ের বিরুদ্ধে কোনো রিভিউ পিটিশন আদালতে দাখিল করেনি। আজ অবধি কলেজিয়াম ব্যবস্থার পরিবর্তে সংসদে কোনো নতুন আইন বা বিল কেন্দ্র সরকার পেশ করেনি। তাই বিচারপতিদের নিয়োগের, ক্ষমতা থেকে যায় কলেজিয়ামের হাতেই। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রাজ্যসভায় জানিয়েছেন— 'সারা দেশে পাঁচ কোটির বেশি মামলা ঝুলে রয়েছে। এটা চিন্তার বিষয়। বিচারপতি নিয়োগ সংক্রান্ত জটিলতার কারণেই এই অবস্থা।' তাই কেন্দ্রের অভিযোগ এবং কলেজিয়াম ব্যবস্থার প্রতি অনীহার কারণ খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ সময়ের দাবি।

পরিশেষে বিচারব্যবস্থার প্রতি নিবিড় শ্রদ্ধা ও আস্থা রেখেই বলা যায়, বিচারব্যবস্থা স্বর্গের নেতাদের দ্বারা গঠিত নয়। সার্বিক সামাজিক অবক্ষয় কিংবা দুর্নীতির ঊর্ধ্বে যে সকলেই বিরাজ করতে পারেন না তাও প্রমাণিত বার বার। আবার পুরাণে স্বর্গের দেবতাদের যেসব কাহিনি আমরা জানি তাঁদের অনেকেও তো দুর্নীতি কিংবা অনৈতিকতার ঊর্ধ্বে ছিলেন না। তাঁদের পদস্খলনের কাহিনিও আমাদের জানা। তাই এই সার কথাটিও আমাদের মনে রাখতে হবে। বিচারব্যবস্থায় নিরপেক্ষতা বজায় রাখার বিষয়ে সকলেরই সতর্ক থাকা উচিত। একই সঙ্গে বিচারপতি নিয়োগের পদ্ধতিকে স্বচ্ছতর করে তুলতে হবে। তবেই দেশের নাগরিকরা অর্থাৎ সাধারণ মানুষ আশ্বস্তবোধ করবেন। বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের বক্তব্য প্রতিফলিত হওয়া উচিত। নতুবা সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে এই অস্বচ্ছতা রীতিমতো বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াতে পারে। বিচারপতিদের কাছ থেকে সর্বদাই যথাযথ ও নিরপেক্ষ ব্যবহার আশা করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের রয়েছে। নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ঔপনিবেশিক কাল থেকেই ভারতবাসীর দাবি। ড. আর আম্বেদকর বলেছিলেন— 'It has been the desire of this country from long past that there should be separation of the judiciary from the executive and the demand has been continued right from the time when the congress was founded. Unfortunately, the British Government did not give effect to the resolution of the congress demanding this particular principle being introduced of the administration of the country.' তাই আইন-প্রণেতাদের খেয়াল রাখতে হবে, সংসদ যেমন সংবিধানের সর্বোচ্চ ধারক ও বাহক, তাই সংসদের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা যেমন জরুরি, তেমনি বিচারবিভাগের স্বাধীনতা ও মর্যাদা রক্ষা করাও জরুরি। বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা অবাধ হলেই দেশের সংসদীয় গণতন্ত্র অক্ষুণ্ণ থাকবে।

(লেখক বিশিষ্ট আইনজীবী)

স্বস্তিকা

(জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক)

২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬, দূরভাষ : (০৩৩) ২২৪১-০৬০৩, ৫৯১৫ E-mail : swastika 5915@gmail.com

স্বস্তিকা গ্রাহক সংগ্রহ অভিযান

আশাকরি আপনি শ্রীভগবানের কৃপায় সপরিবারে কুশলে আছেন। আপনারা অবশ্যই অবগত আছেন যে গত জন্মাষ্টমী তিথিতে (১৯.০৮.২২) স্বস্তিকা পত্রিকা ৭৪ বছর অতিক্রম করে ৭৫ বছরে পা রেখেছে। গত ২২ আগস্ট স্বস্তিকার ৭৫ বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি দিয়ে ৭৫-এর পথ চলা শুরু হয়েছে। বিগত ৭৫ বছরে বহু বাধানিষেধ সত্ত্বেও পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের সার্বিক প্রচেষ্টায় স্বস্তিকা চলার পথকে অব্যাহত রেখেছে। কোনও কিছুর কাছে মাথা নত করেনি। ব্যতিক্রম শুধু গত করোনা মহামারীর কারণে কয়েক সপ্তাহ ছাপার অক্ষরে আপনাদের হাতে পৌঁছোতে পারেনি।

স্বস্তিকার চলার পথে এই শুভ ৭৫-তম বর্ষটিকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে উদ্‌যাপনের জন্য একটি স্বাগত সমিতিও গঠন করা হয়েছে। তাঁরাও এক বছরের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ রাখবেন। তারই প্রথম ধাপ হিসেবে ১৮ ডিসেম্বর, ২০২২ থেকে ৩১ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত স্বস্তিকা গ্রাহক সংগ্রহ অভিযান হাতে নেওয়া হয়েছে। নিজ নিজ প্রান্তে তারিখ সুনিশ্চিত করে অভিযান করবেন।

এ বিষয়ে তিন বঙ্গের সঙ্ঘের বরিষ্ঠ কার্যকর্তা ও বিবিধক্ষেত্রের প্রমুখ কার্যকর্তারা প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করবেন। আমরা চাই সমস্ত খণ্ড/গ্রামস্তর পর্যন্ত কমপক্ষে প্রতি শাখায় দশটি (মিলন ও মণ্ডলী-সহ) স্বস্তিকা পাঠকদের কাছে পৌঁছে যাক। সরাসরি হাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করবে স্বস্তিকা দপ্তর। বিশেষত সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে তথা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অনেক আগ্রহী পাঠক আছেন যাঁরা স্বস্তিকা পড়তে আগ্রহী। এমতাবস্থায় বিনীত আবেদন যে সকলে মিলে একযোগে হাতে হাত মিলিয়ে ৭৫ বছরে ৭৫০০০ স্বস্তিকার গ্রাহক সংখ্যা নিশ্চিত করুন।

তিলকরঞ্জন বেরা
সম্পাদক

DAYAL INDUSTRIES

DAYAL GROUP

MAKER OF INDUSTRIAL BLADES

Works

GOPALPUR HOUSE P.O. : R. GOPALPUR
GOPALPUR, 24 PARGANAS (North), PIN-700 136

Office :

3, Synagogue Street, Room No. 12, 2nd Floor, Kolkata 700 001
PHONE : 22424296/22434571, 033-22421761

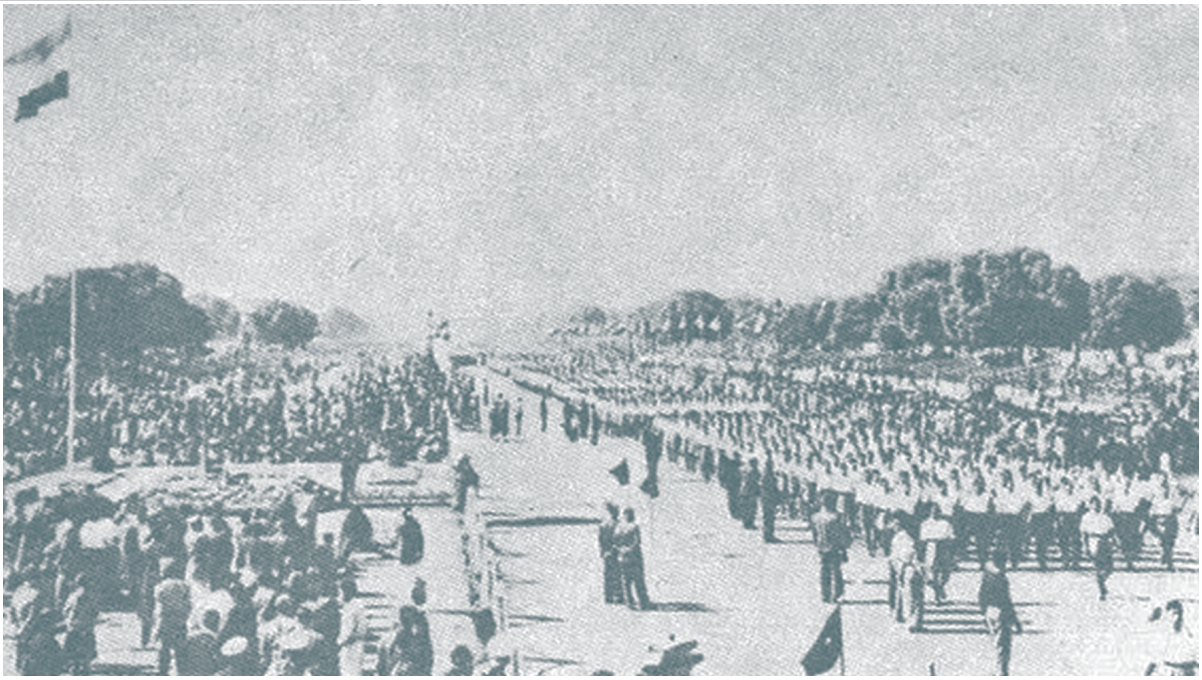

সাধারণতন্ত্র দিবস এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ

ড. শ্রীরঙ্গ গোডবোলে

প্রতি বছর ২৬ জানুয়ারি দিনটি ভারত সাধারণতন্ত্র দিবস হিসেবে পালন করে। অনেকেরই হয়তো জানা নেই, ১৯৩০ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত ওইদিনটি ভারতের 'স্বাধীনতা দিবস' হিসেবে পালিত হতো। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সমালোচকেরা প্রায়ই অভিযোগ করেন যে সঙ্ঘ বরাবর সাধারণতন্ত্র দিবস পালন করা থেকে দূরে থেকেছে। ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি দিনটি পূর্ণ স্বরাজ দিবস হিসেবে প্রথম পালন করা হয়। ১৯৫০-এর পর থেকে দিনটি সাধারণতন্ত্র দিবস হিসেবেই পালিত হয়ে আসছে। সঙ্ঘের সমালোচকরা প্রশ্ন তুলেছেন, ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি সঙ্ঘ কোথায় ছিল কিংবা ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি? এই নিবন্ধে আমরা সঙ্ঘের অভিলেখ্যাগারে সংরক্ষিত তথ্যপ্রমাণ ও মারাঠী সংবাদপত্র কেশরীতে প্রকাশিত একটি খবরের ভিত্তিতে এইসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব। তবে তার আগে একটি প্রশ্ন, ২৬ জানুয়ারি দিনটিকে সাধারণতন্ত্র দিবস বলা হয় কেন?

একটি যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম

দ্য ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট ১৯৪৭-এর ভিত্তিতে অখণ্ড ভারতকে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি স্বাধীন ডমিনিয়নে ভাগ করা হয়। ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের কাছ থেকে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করে দ্য কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি অব ইন্ডিয়া। কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি ১৯৪৯ সালের ২৬ জানুয়ারি খসড়া সংবিধান অনুমোদন করে। কিন্তু কবে থেকে সারা দেশে সংবিধান কার্যকর হবে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া তখনও বাকি। ১৯৫০ সালের শুরুর দিকের কোনও একটা দিন ঠিক করে ফেলাই যেত। কিন্তু নতুন বছরের (১৯৫০) প্রথম দিনটি বেছে নিলে তা ব্রিটিশ শাসনরীতিকে অনুকরণ করা হয়ে যায়। আবার জানুয়ারির শেষ দিনটি বেছে নিলে তা গান্ধীহত্যার দিনের কাছাকাছি হয়ে যায়। জানুয়ারির অন্য কোনও দিন বেছে নিতে অবশ্য কোনও অসুবিধে নেই। কুড়ি বছর আগে জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি দিনটিকে পূর্ণ স্বরাজ দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল (কেশরী, ২৭ জানুয়ারি, ১৯৫০)। ব্রিটিশ শাসকের কাছে পূর্ণ স্বরাজ দাবি করার জন্য কংগ্রেসকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল ১৯৩০ পর্যন্ত। যদিও, এর আগে, পাঁচ দশক জুড়ে অসংখ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী ও তাদের পরিবারবর্গ মৃত্যুবরণ করেছেন, নির্বাসন দণ্ড ভোগ ভোগ করেছেন, দীর্ঘ কারাবাস করেছেন শুধুমাত্র পূর্ণ স্বরাজ দাবি করার ফলে। সম্ভবত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অবদানের কথা মাথায় রেখে কংগ্রেস, বিশেষ করে নেহরু, কংগ্রেসের কাছে ঐতিহাসিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ২৬ জানুয়ারি দিনটি বেছে নেন স্বাধীন সার্বভৌম ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান কার্যকর করার জন্য।

আনন্দ ও অসন্তোষ

নতুন যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম হওয়ার পর ২৬ ও ২৭ জানুয়ারি দিনদুটি জাতীয় আনন্দের দিন হিসেবে ঘোষিত হয়েছিল। প্রশ্ন উঠতে পারে, ভারতের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের কুশীলবরা এই নতুন যুক্তরাষ্ট্রকে কীভাবে নিয়েছিলেন? রাজনৈতিক শক্তির নিরিখে

BANSIDHAR BADRIDAS MODI PRIVATE LTD

EDEN HOUSE

17/1, LANSDOWNE TERRACE

LANSDOWNE MANOHAR PUKUR CROSSING

KOLKATA - 700026

OWNERS : SREE SIBBARI T.E

HEAD-OFFICE

P.O - DIBRUGARH, ASSAM

With best Compliments from :

তোমরা যদি ধর্ম ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাত্য জাতির জড়বাদ-সর্বস্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হও, তোমরা তিনপুরুষ যাইতে না যাইতেই বিনষ্ট হইবে।

—স্বামী বিবেকানন্দ (৫/৪৬)

BHARAT STEEL INDUSTRIES

190, Girish Ghosh Road, Belurmoth, Howrah
Pin- 711 202

কংগ্রেস অবশ্যই অনেকটা এগিয়েছিল। গান্ধীহত্যার কারণে মানুষের আবেগকে কাজে লাগিয়ে নেহরু এই সময় হিন্দুত্ববাদী সংগঠন অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কোমর ভাঙতে তৎপর হয়ে উঠলেন। সঙ্ঘ ও হিন্দু মহাসভার অস্তিত্ব বজায় থাকলে গান্ধীহত্যার পরবর্তীতে দেশের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি আরও অশান্ত হয়ে উঠবে বলে মনে করতেন নেহরু। এই হিন্দু মহাসভার অবিসংবাদী নেতা বিনায়ক দামোদর সাভারকর গান্ধীহত্যা মামলায় গ্রেপ্তার হন। অবশ্য বছর ঘোরার আগেই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। জেল থেকে মুক্তি পাবার পর সাভারকর বলেছিলেন, 'যে সব নাগরিকের মাতৃভূমির প্রতি দায়বদ্ধতা প্রশ্নাতীত, নিঃশর্ত— ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তিলাভের যে আনন্দস্রোত সারা দেশে প্রবহমান— তাদের উচিত এই আনন্দে শামিল হওয়া। এখন আমাদের সমস্ত ক্ষুদ্র আঞ্চলিক, ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক লাভালাভের ভাবনা সরিয়ে রেখে একটাই মঞ্চে মিলিত হতে হবে। সে মঞ্চ আমাদের মাতৃভূমির। এবং এই মঞ্চ থেকেই আমাদের জাতীয় বিজয়ের বাণী ছড়িয়ে পড়বে সারা বিশ্বে।' (বম্বে ক্রনিকল, ৫ এপ্রিল, ১৯৫০)।

অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং সংসদীয় বোর্ডের চেয়ারম্যান আশুতোষ লাহিড়ী সেই সময় ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণের 'অপরাধে' আন্দামানে দীর্ঘ কারাবাসের পর সদ্য মুক্তি পেয়েছেন। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি হিন্দু মহাসভার স্থানীয় শাখাগুলিকে সক্রিয় করে তুললেন এবং নতুন সংবিধান কার্যকর করার জন্য দেশে যে উৎসব চলছিল তাতে শামিল হওয়ার জন্য সকলকে আহ্বান জানালেন (কেশরী, ২৪ জানুয়ারি, ১৯৫০)। ২৭ জানুয়ারি মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত একটি বৈঠকে অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার ওয়ার্কিং কমিটি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে, তাতে নতুন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে স্বাগত জানানো হয় (কেশরী, ৩১ জানুয়ারি, ১৯৩০)।

নতুন যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম শুধু উদ্দীপনা নয়, কোনও কোনও মহলে অসন্তোষেরও সৃষ্টি করেছিল। বামপন্থীরা ২৬ জানুয়ারি মুম্বাইয়ের কালাচৌকিতে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেছিল। পুলিশ স্বাভাবিকভাবেই তাদের চলে যেতে বলে। তাতে তারা পুলিশকে লক্ষ্য করে অ্যাসিড বোমা ছোড়ে। দু'জন পুলিশ অফিসার আহত হন। জবাবে পুলিশ আট রাউন্ড গুলি ছোড়ে। আটজন আহত হন। ৫৫ জন বামপন্থীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে (কেশরী, ২৭ জানুয়ারি, ১৯৫০)। মুম্বাইয়ের কোলাবা এলাকায় একটি জাতীয় পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে বামপন্থীরা বিক্ষোভ দেখিয়েছিল। বিক্ষুব্ধ বামপন্থীরা জাতীয় পতাকা উত্তোলনকারীদের কালো পতাকা তুলতে প্ররোচিত করে। এর ফলে দু'পক্ষের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ বেঁধে যায় (কেশরী, ৩১ জানুয়ারি, ১৯৫০)। কেশরীর রিপোর্টে লেখা হয়েছিল, 'ফরোয়ার্ড ব্লক,

সাধারণতন্ত্র দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন পূর্বতন সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশী।

কৃষক ও শ্রমিক পার্টি এবং অন্যান্য বামপন্থী সংগঠনের অফিসে ২৬ জানুয়ারি কালো পতাকা তোলা হয়। বামপন্থীরা কলকাতা ও মুম্বাইয়ে অন্যায়ভাবে সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত উৎসব নষ্ট করে দেবার চেষ্টা করে।' (কেশরী, ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০)। সেন্ট্রাল প্রভিন্সের কাম্পটিতে একটি মসজিদের সামনে দিয়ে যাবার সময় সাধারণতন্ত্র দিবসের শোভাযাত্রা আটকানো হয়। কারণ শোভাযাত্রায় যাঁরা ছিলেন তাঁরা গান গাইছিলেন। ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদের ছবি লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ে বিক্ষুব্ধরা। গান গাওয়া হবে না— এই প্রতিশ্রুতি দেবার পর শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীরা একদল 'লাঠিধারী অহিন্দু' ব্যক্তির হাতে আক্রান্ত হন। রাস্তায় সশস্ত্র সেনা থাকায় বড়োসড়ো কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি (কেশরী, ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০)।

২৪ জানুয়ারি, ১৯৫০, কেশরী পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, 'কংগ্রেস সেবা দল, বয় স্কাউটস, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও আরও কিছু সংগঠনের কার্যকর্তারা ২৬ জানুয়ারি সকালে প্রভাতফেরি বের করবে। ...এছাড়া, ওইদিন আরও নানান শোভাযাত্রা পুনের ঐতিহাসিক শানিবারওয়াড়ার মাঠে এসে মিলিত হবে।' কেশরী আরও লিখেছে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বালক স্বয়ংসেবকেরা কংগ্রেস সেবা দল ও সোশ্যালিস্ট রাষ্ট্র সেবা দলের কার্যকর্তাদের মতোই সমান উদ্দীপনায় সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত দু'দিনের উৎসবে যোগ দিয়েছিল। মুম্বাইয়ে সঙ্ঘের কার্যক্রমের রিপোর্টিং করতে গিয়ে কেশরী লিখেছে, '২৬ জানুয়ারি সঙ্ঘের অনবদ্য পতাকা উত্তোলন চৌপাটিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানের জাঁকজমক ও শৃঙ্খলা দেখলে পুলিশ ও সেনাবাহিনীও লজ্জা পাবে' (৩১ জানুয়ারি, ১৯৩১)।

পূর্ণ স্বরাজের বন্ধুর পথে কংগ্রেস

১৯২৭ সালের ২৭ ডিসেম্বর, জাতীয় কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে সচিব জওহরলাল নেহরু ভারতের স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। সেই প্রস্তাবনায় বলা হয়েছিল, 'কংগ্রেস এই মর্মে ঘোষণা করতে চায় যে ভারতীয় জনতার লক্ষ্য হবে পূর্ণ স্বাধীনতা (১৯২৭ সালে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের বিয়াল্লিশতম অধিবেশনের রিপোর্টস পৃ. ১৫)। পূর্ণ স্বরাজ ও ব্রিটিশ পণ্য বয়কটের প্রস্তাব গান্ধীজীর খুব একটা পছন্দের ছিল না (মহাত্মা : লাইফ অব মোহনদাস করমর্চাদ গান্ধী, বিঠলভাই. কে. জাভেরি এবং ডি.জি. তেন্ডুলকর, মুম্বাই, ১৯৫১, ভলিউম-২, পৃ. ৪০২, ৪২৯-৪৩০)। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনে জাতীয় কংগ্রেসের সব থেকে বেশি আস্থা ছিল যা জাতীয় কংগ্রেসের তৎকালীন সভাপতি মুক্তার আহমেদ আনসারি গান্ধীজীর ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন, 'within the Empire if possible, without if necessary' (মাদ্রাজ কংগ্রেস রিপোর্ট, অ্যাপেনডিক্স-১, পৃ. ৩)।

ভারতের স্বাধীনতা কোন পথে আসবে— এই নিয়ে কংগ্রেসের নেতাদের মতপার্থক্যের আভাস প্রথম পাওয়া গিয়েছিল কলকাতা অধিবেশনে (২৯ ডিসেম্বর, ১৯২৮—১ জানুয়ারি ১৯২৯)। শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসু পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী ও জাতীয় কংগ্রেসের তৎকালীন সভাপতি মোতিলাল নেহরু ছিলেন ডমিনিয়ন স্টেটাসের সমর্থক। বস্তুত এক সর্বদলীয় বৈঠকে এই ডমিনিয়ন স্টেটাসের ওপর ভিত্তি করেই মোতিলাল নেহরু ভবিষ্যতের ভারতীয় সংবিধান কেমন হবে তার একটি রিপোর্ট পেশ করেন। মোতিলাল নেহরু স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তার রিপোর্ট যদি সর্বাধিক সংখ্যক সদস্যের সমর্থন না পায় তাহলে তিনি বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন না। গান্ধীজী মধ্যপন্থা অবলম্বন করে বলেছিলেন, 'সংবিধান যদি ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৩০-এর মধ্যে গৃহীত না হয় তাহলে সংবিধানের প্রতি কংগ্রেসের কোনও দায়বদ্ধতা থাকবে না। আর ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ওই তারিখের মধ্যে গৃহীত না হলে কংগ্রেস আবার অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করবে (তেন্ডুলকর, পৃ. ৪৩৯-৪৪০)।

গান্ধীজীর দেওয়া সময়সীমা পেরিয়ে যাবার আগেই ৩১ অক্টোবর ১৯২৯, ভাইসরয় লর্ড আরউইন ঘোষণা করলেন যে ডমিনিয়ন স্টেটাস অর্জনই ভারতের সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক পরিণতি। এই ঘোষণা ছাড়াও ২৩ ডিসেম্বর গান্ধীজী জিন্না ও আরও কিছু নেতার সঙ্গে বৈঠকে তিনি বলেন যে তার পক্ষে গোলটেবিল বৈঠকে কোনও একটি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। অর্থাৎ ডমিনিয়ন স্টেটাস অর্জনের সম্ভাবনা তখনই খারিজ হয়ে যায়। নিজের নৌকা নিজেই পুড়িয়ে ফেলেছেন দেখে গান্ধীজী পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব সমর্থন করতে বাধ্য হন। ১৯২৯ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি জওহরলাল নেহরু সারা দেশের সমর্থন লাভ করেন তাঁর পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাবের জন্য। (আর. সি. মজুমদার, হিস্টরি অব দ্য ফ্রিডম মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া, ফার্মা কে.এল. মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, ভলিউম-৩, পৃ. ৩২২, ৩২৫)।

লাহোর অধিবেশনে গান্ধীজী ঘোষণা করলেন যে কংগ্রেসের সংবিধানে ১নং আর্টিকেলে উল্লিখিত 'স্বরাজ' কথাটির অর্থ পূর্ণ স্বরাজ। সুতরাং মোতিলাল নেহরু কমিটির রিপোর্ট এই মর্মে বাতিল করা হলো। আশা করা যায় সমস্ত স্তরের কংগ্রেস কর্মী ভারতের পূর্ণ স্বরাজ অর্জনের লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। (জাতীয় কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনের রিপোর্ট। পৃ. ৮৮)।

স্বাধীনতার আদর্শ ছড়িয়ে দেবার জন্য জাতীয় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি ১৯৩০ সালের ২ জানুয়ারি সিদ্ধান্ত নেয় যে ২৬ জানুয়ারি দিনটি পূর্ণ স্বরাজ দিবস হিসেবে পালন করা হবে। গান্ধীজী একটি ম্যানিফেস্টো তৈরি করলেন। ওয়ার্কিং কমিটি তা গ্রহণ করল। সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো ২৬ জানুয়ারি এই ম্যানিফেস্টো ভারতবর্ষের গ্রামে-গ্রামান্তরে, মহল্লায়-মহল্লায় পড়া হবে। যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে তারা হাত তুলে জানাবেন। তাতেই বোঝা যাবে ভারতবর্ষ কী চায়। (মজুমদার, পৃ. ৩৩১)।

পূর্ণ স্বরাজ অর্জনের লড়াইয়ে সঙ্ঘ কোথায় ছিল? এ প্রশ্নের আলোচনা পরের লেখায়।

(ক্রমশ)